৭১ এ
কি ঘটেছিল
রাজাকার কারা ছিল
খন্দকার আবুল খায়ের
islamirenesaandolon.blogspot.com

৭১-এ কি ঘটেছিল
রাজাকার কারা ছিল

সওয়াল জওয়াব–৫

খন্দকার আবুল খায়ের

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

islamirenesaandolon.blogspot.com

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
বইটা লেখার মূল উৎস	৫
"একাত্তরে কি ঘটেছিল এবং রাজাকার কারা ছিল"	৬
প্রথম অংশের জবাব	৬
বাঙ্গালীদের হিসাবের দর্শন	১১
প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনার মতে কত লোক ম রেছে বলে আপনি মনে করেন	১৩
প্রশ্ন ঃ রাজাকার বাহিনী কেন গঠন করা হয়েছিল এবং তা গঠনের প্রয়োজন কেন হল?	১৫
ষ্টালিনের আমলে দুই কোটি লোককে হত্যা করা হয়েছিল	১৯
উপরোক্ত ছোট্ট খবর থেকে ১০ টি মহাসত্য বেরিয়ে আসছে	২০
স্বাধীনতা লাভের মূলে কারা?	২৪
প্রশ্ন ঃ ৭১ এর যুদ্ধ কি প্রকৃতই স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বলে আপনি মনে করেন?	২৬
১৬ ই ডিসেম্বরের পর	২৭
প্রশ্ন ঃ শেখ সাহেব সম্পর্কে কয়েক ধরনের কথা সমাজে চালু আছে। কেউ বলেন. তিনি অত্যন্ত হিন্দু ঘেঁষা ছিলেন, তাই হিন্দুদের কে দলে নিয়ে হিন্দু রাজ্যের অঙ্গ রাজ্য বানাতে চেয়েছিলেন। এভাবে এক এক গ্রুপের লোক এক এক ধরনের মন্তব্য করেন। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?	২৯
শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ওরিয়ানা ফালাচি	৩১
রোববার সন্ধ্যাঃ	৩১
সোমবার বিকেল	৩২
সোমবার রাত	৩৯
উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে	৪৬
মুক্তিফৌজের হাতে যারা মরেছে	৪৭
পাঞ্জাবীদের হাতে যারা মরেছে	৪৮
১৯৭১ইং স নের স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে ও পরে নিহত ব্যক্তিদের নামের তালিকা	৫৮
মোহন গঞ্জ	৬০
প্রশ্ন ঃ এ সংখ্যাটা এত বড় করে দেখানোতে কি লাভ হয়েছে?	৬৪
একই অপরাধে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই অপরাধী	৬৭
প্রশ্ন ঃ জয় বাংলা না বলার কারণে যে লোক মরলো তারা যদি জয় বাংলা বলতেনই তাহলে তেমন কি অপরাধ হত, এটা একটু বলবেন কি?	৭০
প্রশ্ন ঃ বুদ্ধিজীবিদেরকে কারা হত্যা করল? এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?	৭১

islamirenesaandolon.blogspot.com

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে লোক আমাদের কেমন জানত?	৮১
আমার এ দাবীর স্বপক্ষে মাত্র কয়েকটি যুক্তি দিচ্ছি যথা	৮৩
প্রশ্ন ঃ তাহলে প্রকৃত রাজাকার কারা ছিল?	৮৫
প্রশ্ন ঃ অধ্যাপক গোলাম আযমের মূল অপরাধ কি?	৮৫
প্রশ্ন ঃ বলা হয়ে থাকে এ দেশের ইসলামপন্থীগণ ছিলেন স্বাধীনতার শত্রু। এটা কি ঠিক?	৮৮
প্রশ্ন ঃ জয় বাংলা না বলার কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের দু'চার জনের নাম বলতে পারবেন কি?	৮৯
প্রশ্ন ঃ ইসলাম পন্থীরা কিভাবে আল্লাহর গায়েবী মদদ পেল বলে মনে করেন?	৯৪
প্রশ্ন ঃ গ্রাম অঞ্চলে এমন কিছু ঘটেছে কি যার খবর কেউ জানে না?	৯৯
প্রশ্ন ঃ রাজাকার এবং মুক্তি ফৌজদের মধ্যে আপনি কিরূপ পার্থক্য মনে করেন?	১০৩
প্রশ্ন ঃ দালাল বলতে কি বুঝান হয় এবং দালাল কাদেরকে বলা হয়?	১০৫
প্রশ্নঃ প্রকৃত ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কাদের বলা যেতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?	১০৮
প্রশ্ন ঃ এ রক্ত ঝরা বন্ধ হতে পারে কি করে বলে আপনি মনে করেন?	১১৯
ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে ইনশাআল্লাহ	১২২
প্রশ্ন ঃ জামায়াতের সব লোক কি এক প্রকার ছিল?	১২৪
প্রতিপক্ষের সাথে আচরণ	১২৫
বাংলাদেশের মানুষ তাদের নিজ অবস্থা বোঝে	১২৭
ঈমানী সুতার টানে	১২৮
ভারতের মানেকশ এর মন্তব্য	১২৮
বন্ধুদের মুখ দিয়ে আজ এসব কথা বেরোয় কেন?	১২৯
উপসংহার	১৩১
সর্বশেষ আমার কিছু কথা	১৩২
এখন ৩০ লাখ ওয়ালারা কি বলবেন?	১৩৪
ও আল্লাহ! আজ একি শুনলাম	১৩৬
পরবর্তী প্রশ্ন	১৪১
আমার পরবর্তী নিবেদন	১৪২
একটি গোপন ফাঁস	১৪২
একাত্তরে গণ হত্যার আসল নায়ক কে?	১৪২
"পাকিস্তান প্রশ্নে শেখ মুজিব"	১৪৩

islamirenesaandolon.blogspot.com

বইটা লেখার মূল উৎস

ইতিপূর্বে আমার লেখা সওয়াল জওয়াব (৪খন্ড) বই প্রকাশিত হয়েছে এবং তা বাজারে চালু আছে। আমি সাধারণতঃ যখন এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হই যা প্রকৃত পক্ষে ২/১ জনের প্রশ্ন নয়, বরং তা বহু লোকেরই প্রশ্ন তখন সে প্রশ্নগুলো একত্রিত করে বই আকারে প্রকাশ করি। তাই আমাকে যারা সওয়াল জওয়াবের লেখক হিসেবে চেনেন তারা আমাকে পেলেই কিছু না কিছু প্রশ্ন করেন। কিছুদিন আগে আমার এক কুরআন ক্লাশ থেকে কিছু প্রশ এসেছে, যে প্রশ্নগুলি সম্প্রতি প্রকাশিত ৭১-এর ঘাতক দালালরা কে কোথায়' নামক বইয়ের বক্তব্য থেকে। এ প্রশ্নগুলি এমন যার জবাব গোটা জাতির জন্যেই প্রয়োজন। শুধু প্রয়োজনই নয় বরং তা সর্বাধিক প্রয়োজন। কারণ উক্ত বইটা এখন তো বই আকারেই রয়েছে কিন্তু ভবিষ্যতে ওটা শুধ বই-ই থাকবেনা; তা ইতিহাসে পরিণত হবে। কাজেই এ প্রশ্নগুলির সঠিক জওয়াব এই জন্য আসা দরকার যেন ভবিষ্যত বংশধরগণ যারা ৭১-এর ঘটনাবলী স্বচক্ষে দেখেনি তারা তা (৭১-এর ঘটনাবলীকে) সঠিকভাবে বুঝতে পারে। উক্ত বইয়ে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তা মোটামুটি নিম্নরূপ যথাঃ

১. স্বাধীনতা বিরোধীচক্র পাক আর্মীদের সহযোগিতায় এ দেশের শান্তিকামী ৩০ লাখ লোক হত্যা করেছে।

২. মাত্র ৯ মাসের মধ্যে এত বড় জঘন্যতম নজীরবিহীন হত্যাকান্ড পৃথিবীর বুকে ইতিপূর্বে কখনও ঘটেনি।

৩. প্রতি ইউনিয়নে কমপক্ষে একটা করে গণকবর আছে।

৪. ইসলাম থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে।

৫. ৩০ লাখ লোকের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলাদেশে ইসলাম আর চলতে দেয়া যেতে পারে না।

৬. মুক্তিযুদ্ধ চেতনাকে যে কোন মূল্যে বহাল রাখতে হবে।

৭. পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আছে কিন্তু পঙ্গু রাজাকার নেই কেন?

৮. স্বাধীনতা বিরোধী চক্র কি করে পুনর্বাসিত হয়?

ইত্যাদি দাবীই হচ্ছে বইটার মূল বক্তব্য। এসব বক্তব্য থেকে কিছু প্রশ আসছে। এতে তারই কিছু সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হয়েছে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

"একাত্তরে কি ঘটেছিল এবং রাজাকার কারা ছিল"

এতে রয়েছে ৭১-এ দেশের অভ্যন্তরে প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছিল এবং কি প্রচার করা হয়েছিল ও হচ্ছে। সেই সাথে ৪৭-পূর্ব কিছু ইতিহাস।

এ বইয়ের প্রধান আলোচ্য বিষয়ঃ

- ৭১- এ কারা কত লোক মেরেছে।
- মোট কত লোক মারা গেছে।
- পাড়া গাঁয়ের অবস্থা কি রূপ ছিল।
- যার মধ্যে রয়েছে অনেক অজানা কাহিনী।
- আওয়ামী লীগ ও জামায়াত সর্ম্পকে তখন সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি কিরূপ ছিল।
- আর আছে রাজাকার সমাচার।
- একজন বিদেশী সাংবাদিকের সঙ্গে শেখ মুজিবের একটি সাক্ষাতকার।

প্রশ্ন ঃ আমরা স্বাধীণতার পর থেকেই শুনে আসছি একটা বিশেষ মহল থেকে বলা হচ্ছে ৭১-এর বিপ্লবে মাত্র ৯ মাসে এই ছোট্ট একটি দেশ থেকে লোক মরেছে ৩০ লাখ। আর মেরেছে শুধু পাক বাহিনী এবং তাদের দালালরা যারা ছিল ইসলামপন্থী। এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্য কতটুকু বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর ঃ দেখুন এই প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে দুটি অংশ। যথাঃ

(১) লোক মেরেছে পাক বাহিনী এবং ইসলাম পন্থীরা।

এর প্রথম অংশের জবাব দেয়ার জন্যে আমি কোন উপযুক্ত ব্যক্তি নই। কাজেই কত লোক মরেছে তার কাছাকাছি হিসাব পাওয়ার জন্যে কিছু যুক্তি দিতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আর দ্বিতীয় অংশের জবাব তো ৭১ এ যারা দেশে বাস করত তারা প্রত্যেকেই স্বচক্ষে দেখেছে। তবুও মানুষ যতটুকু জানে ততটুকুই বলব মাত্র।

প্রথম অংশের জবাব

আমার জানা মতে ৭১ এ লোক মরেছে ৪ পর্যায়ে, যথাঃ-

১. ২৫ শে মার্চের পূর্ব পর্যন্ত।

২. ২৫শে মার্চের পর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত।

৩. ১৬ ডিসেম্বরের পর থেকে অস্ত্র জমা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

৪. অস্ত্র জমা দেয়ার পর থেকে ৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট পর্যন্ত।

islamirenesaandolon.blogspot.com

১. ২৫শে মার্চের পূর্বে এক বিশেষ মহল থেকে একটা ধুয়া তুলে দেয়া হল যে বিহারী বাঙ্গালী একে অপরের শত্রু। এই ধুয়া তুলে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করে দেয়া হয়। এতে বাঙ্গালী বিহারী উভয় পক্ষই মারে এবং মরে তবে বিহারী মরে বেশী। এই সময় কোন পক্ষে কত মরল তার কোন সরকারী হিসাব সংরক্ষণ করা হয়েছে কি না তা আমাদের জানা নেই।

২. ২৫শে মার্চের পর থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই সময় ছিল যুদ্ধাবস্থা। এই সময় উভয়পক্ষ মরেছে। তবে বাংঙ্গালীরাই মরেছে বেশী। এ সময় মরার কোন সরকারী হিসাব আমরা পাইনি।

৩. ১৬ই ডিসেম্বরের পর থেকে অস্ত্র জমা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মেরেছে তারাই যাদের হাতে অস্ত্র ছিল। আর মরেছে তারাই যাদের হাতে অস্ত্র ছিলনা এবং যারা ছিল ইসলামপন্থী। এরপর অস্ত্র জমা দেয়ার পরও কেউ কেউ গোপনে অস্ত্র রেখে দেয় যার ব্যবহার এখনও হচ্ছে বলে মানুষ মনে করে। আর যেহেতু কার হাতে কত অস্ত্র ছিল তার কোন সরকারী হিসাব ছিল না, তাই সরকারের পক্ষে সম্ভব ছিলনা তা তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা।

৪. অস্ত্র জমা দেয়ার পরও রাজনৈতিক হত্যা চালু থাকে ৭৫ এর ১৫ ই আগষ্ট পর্যন্ত। তবে এই দুই পিরিয়ডের লোক মরার একটা সরকারী হিসাব আছে। আর এই সময়ের মধ্যে যারা মরেছিল তারা ছিল সাধারণতঃ ৩ শ্রেণীর লোক যথাঃ

১. মুসলমানদের মধ্যে যারা সরকারের উচ্চ পদস্থ ঈমানদার কর্মচারী।

২. মুসলমানদের মধ্যে যারা ঈমানওয়ালা উচ্চ শিক্ষিত ও ইঞ্জিনিয়ার গোষ্ঠী এবং

৩. যারা আলেম-ওলামা হাফেজ কারী ইত্যাদি ধরণের ধার্মিক লোক অর্থাৎ যাদের দ্বারা ইসলামী আন্দোলন পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল।

তখনকার লোক মরার হিসাবটা বেরিয়েছিল ২৪/১১/৭৫ তারিখের দৈনিক ইত্তেফাকে। হিসাবটা বেরিয়েছিল মুজিব আমলের বিভিন্ন অপরাধের একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব নামে। যাতে দেখান হয়েছিল ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হিসাব। যা ছিল নিম্নরূপ। যথা ঃ

islamirenesaandolon.blogspot.com

ডাকাতি	১৭,২১৬
রাহাজানি	১৪.১৮৭
সিধেঁল চুরি	৫৪,৩৯৭
চুরি	৬৩,৪৭০
খুন	১৩৮৬১
দাঙ্গা	৩২,১৫৯
অন্যান্য অপরাধ	১,০২,২২৪
সর্বমোট অপরাধ	**২,৯৭,৫১৪**

এর পূর্বে ২ পিরিয়ডের যে হিসাবটা সরকারী ভাবে দেয়া হয়নি তার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। যা পরে ঝলব্র ইনশাআল্লাহ।

দেখুন বাংলাদেশ খুব একটা বড় দেশ নয়। সরকারের বর্ষ পরিসংখ্যানের হিসাব মোতাবিক- ঐ সময় গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬৮,৩৮৫, ইউনিয়ন ছিল ৪,৪৭২ আর বাড়ীর সংখ্যা ছিল ১,২৬,৭৩,০০০। ১৯৭১ এর লোক সংখ্যা ছিল ৬,৯৭,৭৪,০০০ আর ৭২এর লোক সংখ্যা ছিল ৭,২৩,৯২,০০০। আমরা যদি ৩০ লাখকে ৬৮ হাজার গ্রাম দিয়ে ভাগ দেই তাহলে মোটামুটি একটা হিসাব পেতে পারি যে (৩০ লাখ লোক মরলে) প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে কতজন লোক মারা গেল। এভাবে অংক কষলে দেখা যায় প্রতি গ্রাম থেকে গড়ে ৪৫ জন করে লোক মরলে ৬৮ হাজার গ্রাম থেকে ৩০ লাখ লোক মরে। প্রতি ৪টি বাড়ী থেকে মরা লাগে গড়ে ১ জন করে এবং ৭কোটি লোক থেকে ৩০ লাখ মরলে প্রতি ২৩ জনে ১ জন করে মরা লাগে। এখন আপনারা যারা ৭১ এর ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছেন তারা বলুনঃ

(১) গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে কি ৪৫জন লোক মরেছে?

(২) প্রতি ৪টি বাড়ী থেকে কি গড়ে ১ টি লোক মরেছে?

(৩) প্রতি ২৩ জনে কি গড়ে একজন লোক মরেছে?

৯ মাসে ৩০ লাখ লোক মরলে প্রতি মাসে মরা লাগে ৩০লাখ ৯= ৩,৩৩,৩৩৩ জন করে।

প্রতিদিন মরা লাগে ৩,৩৩,৩৩৩ ÷ ৩০ = ১১,১১১ জন করে প্রতি ঘন্টায় মরা লাগে ১১,১১১ ÷ ২৪=৪৬৩ জন করে। প্রতি মিনিটি মরা লাগে ৪৬৩ ÷ ৬০ = ৮ জন করে। কিন্তু আপনারা যারা দেশে বাস করেছেন তারা বলুন ৯ মাসে প্রতি মিনিটে ৮জন করে লোক মরেছে বলে আপনাদের মনে হয়?

islamirenesaandolon.blogspot.com

মুর্খদের কাছে গোজামিলের হিসাব দিলে তারা না হয় মেনে নিতে পারে। কিন্তু যারা সচেতন তারা কি গোজামিলের হিসাব মানবে?

একটা কথা মনে রাখা দরকার তা হচ্ছে, ধরুন কারো বাড়ী দিনাজপুরের কোন এক গ্রামে কিন্তু বেচারা মারা গেছে ঢাকা থেকে। এ লোকটা সম্পর্কে তার নিজের লোক প্রথমে বলবে সে নিখোঁজ রয়েছে, পরে বলবে সে মারা গেছে। তাহলে তার গ্রামের লোক অবশ্যই জানবে যে আমাদের গ্রামের অমুক মারা গেছে। এভাবে যেকোন টাউন বাজারে হোক বা যুদ্ধের মাঠে হোক যেখান থেকেই মারা যাক না কেন গ্রামে তার নিজ বড়ীর লোক অবশ্যই জানবে। কাজেই যে গ্রাম থেকে মরে নাই,ঢাকা বা যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মরেছে বললে অপর এলাকার লোক না হয় বিশ্বাস করতে পারবে যে গ্রামের কেউ মরেনি কিন্তু তার গ্রামের বাড়ীতে কি তা গোপন থাকবে? তাই আমি যা খবর নিয়েছি,তা গ্রাম থেকেই নিয়েছি। এছাড়াও চিন্তা করুন।

৪,৪৭২টা ইউনিয়ন থেকে ৩০লাখ লোক মরলে প্রতি ইউনিয়ন থেকে গড়ে মরা লাগে (৩,০০,০০০০ ÷ ৪,৪৭২)=৬৭০ জন করে কিন্তু কোন ইউনিয়ন থেকে কি ৬৭০জন লোক মারা গেছে। আমার তো মনে হয় কয়েকটি বিহারী এলাকায় যেখানে অনেক বিহারী নিধন করা হয়েছে, যেমন যশোরের ঝুমঝুমপুর, খুলনার খালিশপুর, বৃহত্তর রংপুরের সৈয়দপুর ,বগুড়ার শান্তাহার, ঢাকার মীরপুর ইত্যাদী স্থান থেকে যেখানে পাইকারীভাবে বিহারী মারা হয়েছে সে সব এলাকা থেকে হয়ত ৬/৭ হাজার লোক মরেছে। তাই বলে সব স্থান থেকে নয়।

আফগানিস্তান থেকে রাশিয়ার নাস্তিক সৈন্যরা যেখানে ১১ বছরে মারল ১৩লাখ সেখানে এই দেশীদের হাতে মাত্র ৯ মাসে মরল ৩০ লাখ? এ কথা কোন পাগলেও বিশ্বাস করতে পারেনা।

বেশী নয়, কোন জায়গা থেকে ১০টা লোক মারা গেলে তাদের লাশ পাশাপাশি রেখে দিন। তারপর দেখুন, তা দেখতে কেমন দেখা যায় এবং তার ফলটা কি দাঁড়ায়। আর একটা থানা থেকে ৬/৭ হাজার লোক মারা কি একটু খানি কথা?

মোট কথা ৪ পর্যায়ে যত লোক মারা গেছে তার মোট সংখ্যা কোন প্রকারেই লাখের উপর উঠবেনা। আমি বক্তা হিসাবে বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে যা মোটামুটি খোঁজ নিয়েছি তার কিছুটা হিসাব দিব ইনশাল্লাহ।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমার জানা মতে এমন বহু গ্রাম, ইউনিয়ন ও থানার নাম বলতে পারব যেখান থেকে কোন লোকই মারা যায়নি। তাই বলে যে মরেনি তা নয়।

মানুষ মরা মানুষের জন্য খুবই আতংকজনক ব্যাপার। কাজেই কোথাও কোন এলাকায় ২/৪ জন লোক মারা গেলে সেই সব এলাকায় হয়েছে দারুণ আতংক। এই আতংকে মানুষ দলে দলে ভারতে পলিয়েছে। কোন এলাকা থেকে যদি ২/৪ জন লোক মারা গিয়ে থাকে তবে সেই এলাকায় কেউই আর দেশে থাকতে সাহস করেনি। তাই তারা দলে দলে সীমান্ত পার হয়ে ওপারে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এটা তো স্পষ্টই মনে আছে। আমাদের যশোরের প্রায় এমন কোন গ্রাম ছিল না যে গ্রাম থেকে ২০/২৫ জন ভারতে যায়নি। কিন্তু এমন বহু গ্রামের নাম বলতে পারব যেসব গ্রাম থেকে একটা লোকও মারা যয়নি। যেমন আমার গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কয়েক গ্রাম থেকে একটাও লোক মরেনি। এর থেকে এটা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, পরিমাণ লোক মরেছে তার চাইতে প্রায় ৪০/৪৫ গুণ বেশী লোক ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এতে কোন সান্দেহ নেই। আর যারা ভারতে গিয়েছিল তাদের সংখ্যা ছিল সরকারী হিসাব মতে মোট ২০ লাখ ২ হাজার ৬ শত ২৩জন।

এই সময় খবরের কাগজে জেলাওয়ারী একটা হিসাবও দিয়েছিল।

এ কথা প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন যে, যত লোক মরেছে তার চাইতে অনেকগুণ বেশী লোক ভারতে গিয়েছিল। আর ভারতে যাওয়ার সংখ্যাই যখন ৩০ লাখে উঠল না, তখন মরার সংখ্যা ৩০ লাখে কি করে উঠবে?

এছাড়া লক্ষণীয় যে, ৭১ এর নভেম্বরের শেষ ভাগে যখন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী আমেরিকা যান তখন তিনি আমেরিকার প্রেসিডেন্টের নিকট হিসাব দিয়েছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১কোটি শরণার্থী আমার দেশে এসেছে। অথচ সরকারী হিসাব ছিল ২০ লাখ ২ হাজার ৬শত ২৩ জন-যে চক্রে ২০ লাখকে ১কোটি বানাতে পারে তারা কোন সংখ্যাকে ৩০ লাখ করছে তা তো কিছুটা অনুমানই করা যায়।

ঐ সময় বাসের মধ্যে এক ক্যানভাসার একদিন বাসে ভীড় দেখে ব্যঙ্গ করে বলছিল, ৩০ লাখ লোক মরে গেল তবুও তো বাসের ভীড় কমে না, এর কারণ কি? ব্যাটা ক্যানভাসার বাসের যাত্রীদের জিজ্ঞেস করা শুরু করল ভাই আপনার ফ্যামিলি থেকে কেউ মরেছে কি ? বলে না, আমার ফ্যামিলি থেকে কেউ মরেনি।

islamirenesaandolon.blogspot.com

এভাবে জিজ্ঞেস করতে করতে একজনকে পাওয়া গেল সে বলল- হ্যাঁ, আমার ফ্যামিলি থেকে নয় তবে আমাদের গ্রাম থেকে একজন লোক মরেছে। তখন ক্যারভাসার বলে উঠলেন, শুনুন ভাই সকল! আমাদের বাংঙালীদের ১টা জীবনের মূল্য অন্য দেশের মানুষের এক হাজার জনের জীবনের সমান। এই হিসাবে আপনার গ্রাম থেকে একটা মরেনি। মরেছে ১ হাজার। এবার কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, আমাদের গ্রাম থেকে মরেছে এক হাজার।

বাংগালীদের জীবনের মূল্য যখন শেখ সাহেব কম মনে করেন না তখন আমরা কেন কম মনে করব? এভাবে কত জনে এই সংখ্যা নিয়ে কতভাবে ব্যঙ্গ করেছে। কিন্তু তা খাতা কলমে আসেনি। এই মাত্র কিছু দিন পূর্বে সাতকানিয়া উপজেলার এক ভদ্রলোক বলছিলেন আমাদের সাতকানিয়া ও লোহাগড়া উপজেলা থেকে পাক সেনারা মেরেছে বার জন হিন্দু আর একজন মুসলমান। আর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তি ফৌজরা মেরেছে সতের জন আলেম। অর্থাৎ আগে মরেছে কম পরে মরেছে বেশী। তবুও লাখে পৌছবে না এ সংখ্যা।

বাঙ্গালীদের হিসাবের দর্শন

আমাদের বাংগালীদের হিসাবের ধরনটা যে একটু ভিন্ন তা আমাদের পুঁথি কেতাব থেকেও জানতে পারি। আমাদের দেশেরই পুঁথি কেতাবে আছেঃ

লাখে লাখে ঝাকে ঝাকে, আইল ছওয়ার।
গুনিয়া দেখে মত্র, চল্লিশ হাজার।

এরপরও আমাদের একটা উপাধি আছে তা হচ্ছে আমরা বাংগালীরা নাকি হুযুগে বাংগালী। আমরা যদি শুনি চিলে কান নিয়ে গেছে তবে চিলের পিছনে ছুটে হাপিয়ে পড়ি কিন্তু কানে হাত দিয়ে দেখি না যে কান সাত্যিকারেই কানের জায়গায় আছে নি নেই?

আমাদের এই চরিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে আমাদের এই দেশেরই সরকারী টেকস্ট বুক বোর্ডের অষ্টম শ্রেণীর বাংলা সাহিত্যের এক কবিতায়। করিতাটির নাম "পণ্ডশ্রম" তাতে লিখেছিল-

এই নিয়েছে ঐ নিল যা, কান নিয়েছে চিলে।
চিলের পিছে মরছি ঘুরে-আমরা সবাই মিলে।
যাচ্ছে গেল সবই গেল জাত মেরেছে চিলে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

পাজি চিলের ভুত ছাড়াব লাথি জুতো কিলে।

....

ছুটতে দেখে ছোট্ট ছেলে বললো কেন মিছে।
কানের খোঁজে মরছ ঘুরে সোনার চিলের পিছে।

....

(বাচ্চাতো) ঠিক বলেছে চিল তবে কি নয়কো কানের যোম,
বৃথায় মাথার ঘাম ফেলেছি পণ্ড হল শ্রম।

এ সব কবিতা যে দেশে চালু সেই দেশেরই রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতার ভাষা হচ্ছে "স্বাধীনতা যুদ্ধে এ দেশের ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে।" এটা কিন্তু স্বারাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের হিসাব নয়। আমরা এটা কি কেউ একবারও ঠান্ডা মাথায় খতিয়ে দেখেছি যে আমার কোন কাছের লোক মরেছে কি? আমার কোন আত্মীয় স্বজন মরেছে কি? আমার গ্রাম থেকেই বা ক'টা লোক মরেছে? বিশেষ করে দেশকে স্বাধীন করার জন্যে কোন নেতা কি জীবন দিয়েছেন? কিংবা কোন নেতার আত্মীয় স্বজন বা পরিবারের কজন লোক মারা গেছে? দেখবেন প্রায় সবাই বলবেন, না তো, আমার তো কেউ মারা যায়নি। তা'হলে এই ৩০ লাখ পুরল কি করে? এ লোকগুলো বাংলাদেশের কোন গ্রামে বাস করত?

শুধু তাই নয়, আপনাকে একটা বিশেষ নিয়ম শিখিয়ে দেই, আপনার সামনে যিনিই বলবেন ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে। আপনি তাকেই জিজ্ঞেস করুন, ভাই আপনার ফ্যামিলির ক'জন জীবন দিয়েছে? অথবা আপনার কাছের কোন লোক মরেছে কি? তাহলে বুঝবেন সংখ্যাটা কত দাড়াঁবে। আমার জানা মতে পাক বাহিনীর লোকেরা যেসব শহর এলাকায় ছিল সেই সব জাযগা থেকে লোক মরেছে। মেরেছে রাস্তার পাশ থেকে আর মেরেছে নদীর কূলের কিছুলোক। কিন্তু পাড়াগাযে তারা ঢুকেছে খুবই কম তাই মরেছেও কম।

যুদ্ধের সময় প্রধানতঃ ২ টি করণে যুদ্ধে মৃতের সংখ্যা বেশী করে দেখানো হয। যথাঃ-

১. মিত্র পক্ষের মনোবল বৃদ্ধির জন্যে।

২. বিদেশীদের সহানুভূতি অর্জনের জন্যে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

মিত্র পক্ষের মনোবল বৃদ্ধির জন্য যখন বলা হয় তখন বলে তারাই যারা মারে। আর বিদেশীদের সহানুভূতি লাভের জন্যে যখন মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি করে দেখান হয় তখন তা দেখায় যারা মরে তারাই। আর এ দুটি কারণই ছিল একই দলের হাতে। কাজেই বাংলাদেশ একটা জাতীয় স্বার্থেই তখন এ সংখ্যাটাকে একটু বৃদ্ধি করে দেখিয়েছে। তাছাড়া এ সমস্ত ব্যাপারে সংখ্যা আসে ২ স্থান থেকে যথাঃ-

১. স্বারাষ্ট্রমন্ত্রণালয় থেকে। (সরকারের পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে এই সংখ্যাটি আসে) এটাকে মোটামুটি সঠিক বলা চলে অর্থাৎ নির্ভুলের সর্বাধিক কাছাকাছি বলা চলে। (এটা নির্ভর করে থানার রিপোর্ট পাওয়ার ওপর)।

২. আর একটা সংখ্যা আসে রাজনৈতিক বক্তৃতার মঞ্চ থেকে। এ সংখ্যাটা কেমন আসে সে বিষয়ে আমরা বাংলাদেশীরা ভালই বুঝি। এই ৩০ লক্ষ সংখ্যাটি হলো সেইরূপ ২য় শ্রেণীর সংখ্যা। অবশ্য এতে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশ লাভবান হয়েছে। অনেক বিদেশীর সহযোগিতা মিলেছে ও সহানুভূতি বেড়েছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। তাছাড়া সংখ্যাটা যখন (যে কারণেই হোক) জাতির জনকের মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে কাজেই হাজার হলেও তা মাথা পেতে মেনে নেয়াটাই হচ্ছে সৌজন্য বোধের লক্ষণ। কাজেই আমরা এ সংখ্যাটিকে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে মেনে নিয়েছি। আমাদের দেশের গন্যমান্য আলেম ওলামা, পীর মাশয়েখও যখন বক্তৃতার মধ্যে এ সংখ্যাটার উল্লেখ করেন তখন তারাও জাতির জনকের দেয়া সংখ্যাটাই অতি দৃঢ়তার সাথেই ব্যক্ত করে থাকেন। তারা একটা বিষয় চিন্তা করেছেন যে, শেখ সাহেব যখন ক্ষমা করে দিয়েছেন তখন শেখ সাহেবের দেয়া সংখ্যাটাকে অস্বীকার করে জাতির পিতার সঙ্গে বেয়াদবী করাটা ঠিক হবে না। অথচ ইতিহাসে তাঁদের ঘাতক বলে চিহ্নিত করা হচ্ছে তা হয়ত তাঁরা চিন্তা করেননি।

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনার মতে কত লোক মারেছে বলে আপনি মনে করেন।

উত্তর ঃ আমার মনে হওয়াটাই যে সঠিক তা বলা যায় না। তবে অনুমানের সঙ্গে অনেকেরই অনুমানের মিল হতে পারে বলে আশা করা যায়। তা নিম্নেরূপ হতে পারে যথা ঃ

(বড় জোর সংখ্যাটি নিম্নরূপ হতে পারে)

islamirenesaandolon.blogspot.com

১. যদিও বলা হয় রক্ষী বাহিনীর লোকেরা ২৭ হাজার মুক্তি ফৌজ হত্যা করেছে তবুও এটা আমার নিকট অতিরিক্ত বলে মনে হয়। তবে এ ব্যাপারে আমি কোন মন্তব্য করতে চাই না।

২. আর মনে হয় যারা রাজাকার ছিল তার মধ্যে যারা লোক হত্যা এবং লুটপাট বেশী করেছিল তাদের মেরে ফেলা হয়েছে। এ সংখ্যা উর্ধে ১৫ হাজার হতে পারে।

৩. আলেম, মৌলভী মাদ্রাসার ছাত্র দাড়ি টুপিওয়ালা লোক এবং জয় বাংলা না বলার কারণে যাদের মারা হয়েছিল তাদের সংখ্যা সব মিলে ২৫ হাজারের মত হতে পারে। তবে এদের বেশীর ভাগ মরেছে নকশালাদের হাতে।

৪. পাঞ্জাবী সৈন্যদের হাতে যারা মরেছে তাদের সংখ্যা বড় জোর ২০ হাজার হতে পারে। এদের বেশীর ভাগ নিরীহ লোক। যাদের সাথে রাজনীতির কোন যোগসুত্র ছিলনা।

৫. গ্রাম্য দলাদলিতে যারা মরেছে তাদের সংখ্যা হাজার দশেকের মত হতে পারে। এদের প্রায় অর্ধেকের বেশী মরেছে নকশালদের হাতে।

৬. আর বিহারী মরার সংখ্যা ৪০ হাজারের মত হতে পারে এসব মিলে সর্বমোট লাখ খানেক মরতে পারে।

আমি একথাও বলি না যে রক্ষী বাহিনী ২৭ হাজার মুক্তিফৌজ মেরে ফেলেছে। আর একথাও বলি না যে লাখ খানেক আলেম মৌলভী মেরে ফেলেছে। আমার দৃষ্টিতে যেটা সঠিকের কাছাকাছি বলে মনে হয়েছে আমি সেইটাই বলেছি। মুখে বলা যায় লাখ লাখ লোক মরেছে। কিন্তু ১ লাখ লোক এক জায়গায় করে কেউ দেখেনি যে সে সংখ্যাটা কত বড়।

প্রশ্ন ঃ শেখ মুজিব বলেছেন পাঞ্জাবীরা শতকরা ৪০ টি বাড়ী পুড়িয়েছে? এ ব্যাপারে আপনার কি জানা আছে এবং ২ লাখ নারী ধর্ষণের ব্যাপারটা কতটুকু সত্য।

উত্তর ঃ কিছু ঘর পোড়াপুড়ি হয়েছে তবে এমন হয়নি যে তা শতকরা ৪০ টি বাড়ী হবে। আপনিও বাংলাদেশের কোন না কোন গ্রামের মানুষ। আপনি বলুন আপনার গ্রামের ক'টা বাড়ী পুড়েছে। কোথাও কিছু বাড়ী পুড়ালে তা সঙ্গে সঙ্গে সর্বত্র প্রচার হয়ে পড়েছে ব্যাপকভাবে। আর নারী ধর্ষণ কম হোক বেশী হোক সেটা আমার নিকট মূল কথা নয়। এটা যে হয়েছে এটাই

islamirenesaandolon.blogspot.com

সত্য এবং এ জন্যে তাদের উপর নেমে এসেছে আল্লাহর গজব। এ ব্যাপরে পাঞ্জাবীরা যেমন দোষী ছিল তাদের সঙ্গে দেশের লোকও কম দোষী ছিল না। আর এ দোষ অব্যাহতভাবে চালু ছিল ১৬ই ডিসেম্বরের পরেও। এ কাজ যেই করুক সে আমার লোকই হোক বা অন্য লোকই হোক এটা যে জঘন্য কাজ হয়েছে এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

এ ব্যাপারে বলা হয়, ইসলামপন্থী দলগুলি তাদের সহয়তা করেছিল। এটা সম্পূর্ণ ভুল কথা কারণ নারীদের উপর অত্যাচারের সুযোগ পেলে তারা নারীদের নিকট জিজ্ঞাসা করেনি যে এরা কোন দলের লোক। কাজেই এ ব্যাপারে গাত্রদাহ ছিল প্রত্যেকের সমানভাবে। তবে পাকিস্তান পন্থীরা এর যতই প্রতিবাদ করুক না কেন তা কোন খবরের কাগজে ছাপা হয়নি এবং যেহেতু পাকপন্থীরা পাকবাহিনীর সমর্থক ছিল তাই পরোক্ষভাবে হলেও তারা পাক বাহিনীর যাবতীয় অপকর্মের দুর্নামের ভাগী হয়ে পড়েছে।

প্রশ্ন ঃ রাজাকার বাহিনী কেন গঠন করা হয়েছিল এবং তা গঠনের প্রয়োজন কেন হল?

উত্তর ঃ সম্ববতঃ কেউই এ কথা ভুলে যায়নি যে প্রথমে শেখ সাহেবের আহবানে দেশের যুবক ছেলেদের হাতে রাইফেল এসে যায়। তখন তারা এক তরফাভাবে তাদের প্রতিপক্ষদের মারতে থাকে। এ সময় কম্যুনিষ্টরা একটা সুযোগ গ্রহণ করে। তারা নক্শালী গেরিলা কায়দায় তিন শ্রেণীর লোকদের মারা শুরু করে দেয়। যথাঃ-

(১) যারা ছিলেন ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান ও মেম্বার,

(২) আর যারা ছিলেন ধনী শ্রেণীর লোক,

(৩) আর যারা ছিলেন কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রচার করার মত ইসলামপন্থী লোক।

যেমন যশোরের বাঘারপাড়া থানার জামদিয়া এলাকার আশপাশের প্রায় ২৫/৩০ টা গ্রাম থেকে নক্শালরা প্রায় ৩০/৪০ জন লোক মেরে ফেলে তাদের মধ্যে কয়েকজন ইউ.পি চেয়ারম্যানও ছিলেন। নড়াইলের অধীনে চারখাদার মাওঃ বজলুর রহমান সাহেবকে এবং আরো অনেককে মেরে ফেলে। এরপর মুক্তিফৌজরা এক দিকে নক্শালদের অপরদিকে আওয়ামী লীগের প্রতিপক্ষদের মারতে থাকে। এরপর এই সব মারমারি ঠেকানোর জন্যেই রাজাকার বাহিনী তৈরী করা হয়। কিন্তু একমাত্র নকশালরা ছাড়া

islamirenesaandolon.blogspot.com

আদর্শগত দৃঢ়তা আর কোন বাহিনীর মধ্যেই তেমন একটা ছিল না। ফলে প্রত্যেকেই সুযোগ নিয়েছে।

আমি যে, এলাকার কথা বললাম ঐ এলাকায় ছিল আসাদ নামে এক নকশাল, তার বাহিনীর নাম ছিল আসাদ বাহিনী ॥ আর নারিকেল বাড়ীয় (একই থানার মাধ্যে) গ্রামে ছিল মুসা নামে এক নকশাল। সে ছিল সব চাইতে নির্ভীক। দিনে দুপুরে ঘোড়ায় চড়ে তরবারি, রামাদা হাতে করে বেড়াতো, প্রতিপক্ষ যাকে পেত তাকেই মারত। পরে নভেম্বরের মুক্তিফৌজদের হাতে ঐ মুসা মারা পড়ে ॥ তারা তার গায়ের গোস্ত টুকরো টুকরো করে ছাড়িয়েছিল বলে দূর থেকে শুনেছি। আর শালিখা থানায় একজন কম্যুনিষ্ট নেতা আছেন তিনি অত্যন্ত চতুর, ধরি মাছ না ছুই পানি এমন অবস্থার লোক তিনি। তার আচরণ অত্যন্ত মধুর, কারো সঙ্গে তার কোন ঝগড়া বিবাদ নেই লেন-দেনে অত্যন্ত সৎ। কিন্তু তার গোপন ট্রেনিং ছিল কম্যুনিষ্ট বিরোধী লোক এবং চোর-ডাকাত সব শেষ করে দাও। তার এলাকায় প্রায় শতাধিক লোক মারা পড়েছে তারই বাহিনীর হাতে কিন্তু তিনি সবার দৃষ্টিতে খুব ভাল লোক।

ঐ সময় মনে করা হয়েছিল যারা হিন্দুদের আধিপত্য বিস্তারের পথকে রুদ্ধ করতে পারবে তাদের দ্বারাই রাজাকার বাহিনী গঠন করা হবে। তারা একদিকে অশান্তি ছড়াতে দেবে না অপরদিকে দেশটাকে ভারতীয় অগ্রাসন থেকে উদ্ধার করবে।

কিন্তু তাদের চাকুরী দিয়েছিল মিলিটারীরা। ফলে তাদের মধ্যে কম্যুনিষ্টসহ সব আদর্শের লোকই ঢুকে পড়ে। বিশেষ করে চোর-ডাকাতরাই বেশী ঢুকে পড়ে রাজাকারে। ফলে উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যায়। তাছাড়া মুক্তিফৌজরাও বুঝতে পারেনি যে আমরা পাকিস্তান ভাঙ্গার জন্যে যুদ্ধ করছি। তখন আদর্শগত ট্রেনিং পাওয়া লোক খুবই কম ছিল।

অবশ্য যারা ছিল তারা জান জীবন দিয়ে স্ব স্ব আদর্শের উপর টিকে ছিল। তখন অল্প সংখ্যক ছাড়া সবাই ছিল লুট পাটের সুযোগ নেয়ার জন্য। আর পাকপন্থী আদর্শবাদী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ তারা ভালই এবং স্পষ্টই বুঝেছিলেন যে, যারা কোন দিন মুসলমানদের বন্ধু নয় তারা কেন হঠাৎ করে মুসলমানদের সাহায্যের জন্যে জান জীবন দিয়ে এগিয়ে আসছে? তাদের উদ্দেশ্য যে ভাল নয়, তা দেশের মুরব্বি শ্রেণীর প্রত্যেকেই বুঝতে পেরেছিলেন, আর বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভারতের আসল মতলবটা কি? তারা কেন রাতারাতি মুসলমানদের বন্ধু সেজে বসল।

islamirenesaandolon.blogspot.com

এই হিন্দুদের সঙ্গে বাস করতে না, পেরেই একদিন ভারতকে ভেঙ্গে হিন্দু ভারত ও মুসলিম ভারতে বিভক্ত করতে হয়েছিল। দু'টি পৃথক রাষ্ট্র গড়তে হয়েছিল। তখনকার বাস্তব ইতিহাস তো বয়স্কদের সামনেই ঘটেছিল তাই ভারতীয়দের তারা বিশ্বাস করতে পারে নাই।

উদাহরণ স্বরূপ বলছি, তখন আমরা জানতাম দেশ ভাগ হলেও বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হবে না। এরপর যখন বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব ভাগ হওয়ার সিদ্ধান্ত হল তখনও জানতাম ভাগীরথী নদীই হবে বর্ডার এবং প্রাকৃতিক সীমারেখাই হবে দুই দেশের সীমারেখা। তখন কেউই অনুমান করতে পারেনি যে, জেলা এবং থানা পর্যন্ত বিভক্ত হবে এবং জমিনের আইলের উপর দিয়ে দুই দেশের বর্ডার হবে।

পরে যা শুনেছি তা হচ্ছে এই যে, ভারতের অগাধ টাকা পয়সার মালিক হিন্দু মাড়োয়ারী ও বড় বড় ধনী হিন্দুরা র‍্যাডক্লিফকে এক বস্তা সোনা ঘুষ দিয়ে এমনভাবে বর্ডার করে নেয় যেন পায়ে হেঁটে ভারত থেকে এদিকে বাংলাদেশে আর ওদিকে পাকিস্তানে প্রবেশ করা যায়। ওদিকে, পাঞ্জাবের জলন্ধর ও গুরুদাসপুর জেলা দুইটির মোট লোক সংখ্যার শতকারা ৫৫ জন ছিল মুসলমান তবুও পায়ে হেঁটে পাকিস্তানে প্রবেশ করার পথ করে নেয়ার জন্যে ঐ দুইটি জেলা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া সত্বেও ভারতকে দিয়ে দেয়া হলো।

তাছাড়া পৃথিবীর কোথাও যার নজীর নেই তা হয়েছে ভারতকে ভাগ করার সময়। মহেশপুর এলাকায় তো আমি নিজে সচক্ষে দেখেছি কারো থাকার ঘর পড়েছে বাংলাদেশে এবং রান্নাঘর পড়েছে ভারতে। একই মাঠে ভারত ও বাংলাদেশের জমি। হালচাষ করার সময় বাংলাদেশের হালের গরু বার বার ভারতের জমির উপর দিয়ে ঘুরে আসে। পৃথিবীর কোথাও কি আছে এইরূপ সীমা রেখা?

তাছাড়া পূর্ব সীমার বাংলাদেশের 'কসবা' ও পশ্চিম সীমায় 'হিলি' এই দু'টি রেল ষ্টেশন তো এমন যে রেল লাইনের ২/৩ মিটার পরিমাণ জমির পরেই ভারতের সীমানা, হিলি রেলষ্টেশনের যেমন পশ্চিম গেট পার হয়ে ওপারে বাংলাদেশের কোন ভূমি নেই। কসবা ও হিলির মাত্র ৪/৫ মিটার ভূমি ভারত যদি দখল করে নেয় তবে একদিকে ঢাকা-চাটগাঁ সিলেট-চাটগাঁ রেল যোগাযোগ শেষ হয়ে যাবে। তেমনই খুলনা পার্বতীপুর বা খুলনা-উত্তরঙ্গ রেল যোগাযোগ শেষ হয়ে পড়তে বাধ্য। দেশের অবস্থানটি এমনভাবে করে

islamirenesaandolon.blogspot.com

নিয়েছে যে, ভারত ভিন্ন রাষ্ট্র হয়েও তাদের দয়ার উপর আমাদের টিকে থাকতে হবে।

তাদের তো আমাদের প্রতি এত দরদ যে আমাদের তালপাট্টি তারা দখল করে নিল তাতেও আমাদের বলার কিছু নেই। বেরুবাড়ী দখল করে নেয়ার পর এই ১৮ বছরেও তিন বিঘা করিডোর আমাদের এখনও দিচ্ছে না। আমাদের ছিটমহলে আমরা প্রবেশ করার পথ পাচ্ছি না। যারা ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে এবং অন্য সব নদীগুলোর উজানে বাঁধ দিয়ে আমাদের দেশকে মরুভূমিতে পরিণত করতে চায়, যারা প্রকৃতিক পানির স্রোতকে ভিন্নমূখী প্রবাহিত করে আমাদের পানিতে ডুবিয়ে মারতে চায়। রাতারাতি তারা আমাদের বন্ধু হওয়ার পিছনে যে ভারতের কোন নিজস্ব কুমতলব ছিল কিংবা ভাবলক্ষণ যে ভাল নয় এ যারা বুঝেছিলেন, তাঁরা দেশটাকে হিন্দ অধিপাত্যবাদের হাত থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যেই ৭১ এ ভিন্ন মত পোষণ করেছিলেন। কেন যে এ দেশের একটা গ্রুপ ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন তা দেশের যুবক ছেলেরা একদিন না একদিন উপলব্ধি করবেই। তা আজই হোক বা কালই হোক।

এরপরও আমাদের একটু ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখতে হবে যে, পাঞ্জাবীরা আমাদের শত্রু হতে পারে কিন্তু পাঞ্জাবী অর্থ তো ইসলাম না। বাংলাদেশ হওয়ার পর মুসলিম নামগুলোকে কেন মুছে দেয়া হল? জিন্নাহ হলো কেন হ'ল সূর্যিসেন হলো?

নজরুল ইসলাম কলেজের নাম। থেকে ইসলাম শব্দটা বাদ দেয়া হলো কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোগ্রাম থেকে কেন আল্লাহর নাম বাদ পড়লো? এরা কি আপরাধ করেছিল? আল্লাহু আকবারের পরিবর্তে জয় বাংলার শ্লোগান কেন হলো, আল্লাহু আকবার কি দোষ করেছিল? আল্লাহু আকবার তো পাঞ্জাবী নয়?

এ ধরণের বহু আগামী প্রশ্ন যাদের মগজে ঢুকেছিল তারা বাধ্য হয়েছিল রাজাকার, আলবদর ইত্যাদি বাহিনী গঠন করতে। এর পরের ঘটনা হলো নকশালসহ যারাই লোক মারল তাদের সব দোষ গিয়ে ঘাড়ে চাপল ইসলাম পন্থীদের। কিন্তু কারা কত লোক মেরেছে তা একদিন না একদিন বেরুবেই। যেমন বেরিয়েছে রাশিয়ায় বিজয়ী পক্ষের ধরনই এই যে যারা পরাজিত তাদের ঘাড়েই সব দোষ চাপায়।

দেখুন না ৫০ বছর পর আজ রাশিয়া থেকে খবর বেরুচ্ছে, ষ্টালিনের

islamirenesaandolon.blogspot.com

গোপন বাহিনী যে দুই কোটি লোক মেরেছিল তার সম্পূর্ণ দোষ চাপিয়ে ছিল নাজীদের ঘাড়ে। এরপর তিন তিনটি কমিশনের কারো সাহস হয়নি যে সত্য প্রকাশ করবে পরে যখন প্রেসিডেন্ট গরবাচেভ তার গ্লাডনষ্ট নীতি ঘোষণা করলেন তখনই ফাঁস হলো যে ষ্টালিনের লোক যখন এদেরকে হত্যা করে তখন নাজিরা সে এলাকায় প্রবেশই করেনি। ৫০ বছর পর এটা আজ ফাঁস হয়ে পড়ল। ঠিক তেমনি দেখবেন এটাও ফাঁস হয়ে পড়বে যে, ১৪ ই ডিসেম্বর কোন রাজাকার, আলবদর আসসামস ঢাকায় ছিল না এবং কাদের হাতে কত লোক মরেছে। এবার পড়ে দেখুন ১৩৯৫ বাংলা সনের ১৩ই চৈত্রের ইত্তেফাকের ভিতরের ৩ ও ৯ পৃষ্ঠা থেকে ষ্টালিনের আমলের সাধ ঘটনা।

ষ্টালিনের আমলে দুই কোটি লোককে হত্যা করা হয়েছিল

মস্কো হতে এপি- গত শুক্রবার তাস জানিয়েছে কিয়েভ শহরের বাইরে অবস্থিত গণকবরে যে হাজার হাজার লোককে সমাধিস্থ করা হয়েছে তারা যে ষ্টালিনের আমলের নির্যাতনের শিকার, সরকার নিয়োজিত একটি কমিশন এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে। কমিশন আরো জানিয়েছে, তাদের মৃত্যু নাজীদের হাতে ঘটে নাই। বাইবোভিনিয়া গ্রামের বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিবর্গ সাক্ষী দিবার সময় উল্লেখ করেন যে, ১৯৩০- এর দশকে তাঁরা গণকবরের নিকটবর্তী স্থানে গাড়ীর ভিতর হতে রক্ত ঝরে পড়েছে এমন ধরনের যানবাহন চলাচল করতে দেখেছেন। তখনও নাজীরা উক্ত স্থান দখল করেনি বলে তাঁরা জানান।

বেসরকারী হিসেব অনুযায়ী গণকবরে ২ হতে ৩ লাখ লাশ রয়েছে বলে জানান হয়েছে। ১৯৮৮ সালের মে মাসে নাজীদের যুদ্ধ অপরাধী সাব্যস্ত করে ইউক্রেনে একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করবার পর বাইকোভিনিয়া গ্রামের অধিবাসীরা পাঁচ দশকের নীরবতা ভঙ্গ করে একে জোসেফ ষ্টালিনের গোপন কমিশন গঠনে বাধ্য করে। তারা অভিযোগ করে যে, ইতিপূর্বে নিয়োজিত তিনটি কমিশনই সত্য ঘটনা চাপা দিয়ে নাজীদের দোষী সাব্যস্ত করেছে। তাস পরিবেশিত গত শুক্রবারের খবরে অবশ্য পূর্বের তিনটি কমিশন সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করা হয়নি। তদন্তকারী কমিশনের প্রধান বিকটর কুলিক বলেছেন কবরের ভিতরে যে সব দ্রব্যসামগ্রী পাওয়া গেছে সে সবের গাত্রে পারিবারিক নাম উৎকীর্ণ রয়েছে। কমিশনের সদস্যবর্গ উহা প্রত্যক্ষ করেছেন।

islamirenesaandolon.blogspot.com

পশ্চিমা দেশের ঐতিহাসিকদের অনুমান, ষ্টালিনের আমলে ২ কোটি লোককে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু গত প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ সোভিয়েত কর্মকর্তারা ষ্টালিন আমলের অন্ধাকারাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলো সম্পর্কে নীরবতা পালন করে আসতেছিল। ১৯৮৭ সালে প্রেসিডেন্ট গর্বাচেভের গ্লাসনষ্ট নীতি ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে নতুন করে তদন্ত শুরু করা হয়। ১৯৮৭ সালে মিকোলা লাইসেনকো! নামক এক ব্যক্তি উক্ত স্থান হতে কিছু অস্থি ও মাথার খুলি উদ্ধার করে। তিনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে ইহার অন্তর্নিহিত সত্য উদঘাটনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং এ ব্যাপারে ইউক্রেনের লেখক ইউনিয়নের সমর্থনও আদায় করতে সক্ষম হন।

উপরোক্ত ছোট্ট খবর থেকে ১০ টি মহাসত্য বেরিয়ে আসছে

১। যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় তারা বিজয়ী দল হলে তাদের যাবতীয় অপকর্মের দোষ চাপায় পরাজিতদের ঘাড়ে।

২। তাদের আমলে যত তদন্ত কমিশনই গঠন কবা হোক না কেন তারা থাকে সম্পূর্ণ অসহায়। সত্য রিপোর্ট তারা দিতেই পারে না। কর্তৃপক্ষের মর্জি মুতাবিক তাদের রিপোর্ট দিতে হয়।

৩। প্রত্যক্ষদর্শিরাও সত্য সাক্ষী দেয়ার হিম্মত রাখে না কিন্তু সত্য তাদের মন থেকে ধুয়ে মুছে ফেলতে পারে না কেউই। মুখে না পারলেও মনের মধ্যে গোপন করে রাখে সময় পেলেই বলে ফেলে।

৪। সত্য একদিন না একদিন প্রকাশ হয়েই পড়ে। তা সত্যবন্ধ সিং-এর ন্যায় ফাসি কাষ্ঠে ঝুলায় পরে হলেও।

৫। বিজয়ী পক্ষ যাহা অসত্য হলেও তা কিছু দিনের জন্য টিকিয়ে রাখতে পারে, তা যত অল্প দিনের জন্যেই হোক না কেন।

৬। পরাজিত পক্ষ হাজার সত্য কথা বল্লেও প্রথমদিকে তা কেউ মানতে চায় না, যদিও পরে তা মানে।

৭। পরাজিত পক্ষ হাজার সৎ লোক হলেও তাদের দেখা হয় দোষী ব্যক্তি হিসেবে।

৮। আর বিজয়ী পক্ষ হাজার খুনী হলেও তাদের দেখা হয় গুনি ব্যক্তি হিসাবে।

৯। ইতিহাসের চাকা এক জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে থাকে না, তা ঘুরতে থকলেও ক্ষমতাসীনদের নজর কোনো দিনই পিছন দিকে ফিরে না ঘাড় তারা পিছনে ফিরাতেই পারে না।

islamirenesaandolon.blogspot.com

১০। জ্ঞানী লোক বিগত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কিন্তু হাজার জ্ঞানী হলেও ক্ষমতাসীনদের নজর কোন দিনই পিছন দিকে ফেরে না।

এসব সত্যগুলো এ ছোট খবরটুকুর ভিতর নিরবে লুকিয়ে রয়েছে। কিন্ত প্রকৃত সত্য বেরিয়ে পড়লই। ঠিক এ পথেই একদিন বাংলাদেশের ৭১ এর সঠিক ইতিহাস বেরিয়ে পড়বেই। প্রয়োজন কিছু সময়ের মাত্র। সেদিন এটাও ফাঁস হয়ে পড়বে যে বাংলাদেশের কম হলেও প্রায় ১ লাখ মুসলিম যুবক ছেলেদের মেরে ফেলার মূল পরিকল্পনা কাদের তৈরী এবং কোথায় বসে তৈরী হয়েছিল। যেসব যুবক ছেলেরা মরেছিল তারা প্রায় সবাই ছিল মুসলমান, তা সে রাজাকারই হোক কিংবা মুক্তিফৌজই হোক। কিন্তু পরে তারা হিন্দ মুসলমান চিনবার জন্যে কালেমা পড়তে বলতো যারা কালেমা পড়তে পারত তাদের মারত না।

আমার জানা মতে শালিখা থানার বুনাগাতির আশপাশ থেকে ২/৪ জন হিন্দু মরার কথা শুনেছি আর শুনেছি খেতলাল (বগুড়া) থেকে ৫/৬ জন আর চট্টগ্রামের সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া থেকে ১২ জন হিন্দু মরার কথা। আর খুলনার কিছু হিন্দু মরার কথা। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে ছিটে ফোটা ২/১ জন যে মরে নাই তা নয় তবে প্রত্যেকেই মনে মনে একটু নিজ নিজ এলাকার হিসাব নিয়ে দেখবেন যে যারা মরেছে এরা ২/১ জন বাদে সবাই ছিল মুসলমান। কিন্তু এদের মরার মূল পরিকল্পনা করে ছিল হিন্দুরা।

রাজাকার মরলেও তাদের শত্রু কমেছে মুক্তিফৌজ মরলেও তাদের শত্রু কমেছে। এ সত্যটি কেউ কেউ তখন থেকেই উপলব্ধি করতে পেরেছেন। আর কেউ এখনও তা উপলব্ধি করতে পারেনি। তারা জানত যে মুসলমানরা এক জায়গায় ঠিকই আছে তা হচ্ছে মূল ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কিংবা কুরআনের বিরুদ্ধে সরাসরি কোন কথা বললে তখন ওরা এক দল, একমত। যার প্রমাণ পেয়েছি এবার সারা পৃথিবীতে আবার নূতন করে স্যাটানিক ভার্সেসেসের প্রতিবাদের ঝড় থেকে।

এ কারণেই শত্রুরা দেখেছিল মুসলমানদের যুবক ছেলে যারা যোদ্ধা হওয়ার মত তাদের সংখ্যা কমাতে হবে। কিন্তু তা বুঝলাম না আমরা তালকানা মুসলমানরা। ১৬ ই ডিসেম্বরের পর তো যারাই ধুতি পরতো এবং হিন্দু বলে চেনা যেত তারা ছিল সম্পূর্ণ নিরাপদ। তখন চিমটি ধারী গেরুয়া পোষাক পরিহিতদের মনে করা হয়েছে দেশের সুনাগরিক আর দাঁড়ি টুপি দেখলেই তাদের দেশের শত্রু মনে করা হত। রাস্তায় বের হওয়াই ছিল তখন

islamirenesaandolon.blogspot.com

দারুণ বিপদ। এমন কি বাসের এবং ট্রেনের ভিতর থেকেও দাঁড়ি-টুপি ওয়ালা লোক দেখলেই তাদের টেনে বের করে আনা হত এবং মেরে ফেলা হত।

একমাত্র মুসলমানদের একটি স্থান ছিল কিছুটা নিরাপদ সেটা ছিল কাকরাইল মসজিদ এবং তাবলীগ জামায়াতের দল। এছাড়া বাংলাদেশের আর কোথাও নিরাপদ স্থান ছিল বলে আমার জানা নেই। দেশের ঈমানদার লোকদের জন্যে ঐ দিনগুলো ছিল ছোটখাট কিয়ামতের ন্যায় ভয়াবহ। যার সাক্ষী খোদ দেশের গণ মানুষ।

সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলে রাখা দরকার যে, আমি যদিও বুঝতাম যে ভারতীয় হিন্দু নেতারা কোন দিনই জাতি হিসেবে মুসলমানদের ভাল নজরে দেখতে পারেনি, এখনও পারছে না এবং ভবিষ্যতেও পারবে না- তবুও বাংলাদেশের হিন্দুদের প্রতি আমি সর্বক্ষণই সহানুভূতিশীল। এর সাক্ষী আমার নিজ এলাকার হিন্দুরা। মুরগীর বাচ্চা যেমন তাদের মায়ের পাখার নীচে আশ্রয়ে পায় আমার এলাকার হিন্দুরা তেমন নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল আমার নিকট ছিল ৭১ এ। আমি লিখছি একটা বইয়ে যা পড়বে সবাই। এর মধ্যে অতিরঞ্জিত কিছু থাকলে অবশ্যই প্রতিবাদ আসবে। আর যারা আমার নিজ এলাকার তারা আমাকে যত সাহসের পাত্র মনে করত তেমন তাদের অনেক আপন জনকেও তারা মনে করতে পারেনি বলে আমি নিশ্চিত বিশ্বাস রাখি।

মানুষ হিসেবে তাদের সঙ্গে আমার কোন বিদ্বেষ নেই কিন্তু তাদের ধর্মকে আমি একেবারেই ভুল ধর্ম মনে করি এবং ধর্মীয় ব্যাপারে যে তারা ভুলের মধ্যে রয়েছে এটা সব সময়ই বিশ্বাস করি এবং তা তারা ভালই জানেন। এবং তাদের ইসলামের দিকে দাওয়াতও দিয়ে থাকি। আমার আহবানে অনেক সাড়া ও পেয়েছি, অনেকে আমার নিকট ইসলাম গ্রহণও করেছে এর বহু প্রমাণ বাংলাদেশে রয়েছে। তাদের প্রতি আমার বিদ্বেষভাব থাকলে আমি অবশ্যই তাদেরকে দরদের সাথে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাতে পারতাম না-এটা তো সাধারণভাবেই বোঝা যায়।

মানুষ হিসেবে সবাইকে আমি বনি আদম হিসেবেই দেখি। যদিও বিশ্বাসের ব্যাপারে ভিন্ন বিশ্বাস রাখি। আমার বিশ্বাস আমার কাজে, আমার কথায়, লেখায় এবং বক্তৃতায় প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু বিদ্বেষভাব আমার কারো প্রতিই যে নেই তা ৭১ এ মানুষ ভালভাবেই উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে। এতকিছুর পরও বলছি ভারতীয় হিন্দু নেতাদের কোন দিনও আমি মুসলমানদের বন্ধু মনে করতে পারব না, পারবনা আমাকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলালেও।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমার মৃত্যুর পরেও ভারতীয় হিন্দু নেতাদের আমি মুসলমানদের শত্রুই মনে করব। এটাই আমার মনের কথা যা আমি মনের মধ্যে গোপন রেখে মুনাফিক হতে চাই না। আমি ৪৭ এ দেশ ভাগ হওয়ার পর থেকে এটাও উপলব্ধি করেছি যে, যেসব হিন্দুরা পাকিস্তানের সীমানায় পড়েছিল তারা এ দেশকে যদি সত্যই ভালবাসত তাহলে পৈতৃক ভিটে মাটি ফেলে তারা কেন ভারতে চলে গেল। আর মুসলমান যারা ভারতে পড়েছিল তারা অনেকেই কেন তাদের ভিটে মাটি ফেলে এ দেশে চলে আসল? কেন ভারতে মুসলমান প্রেসিডেন্ট হতে পারে কিন্তু পারে না প্রধানমন্ত্রী হতে? কেন সেখানকার প্রধান সেনাপতি মুসলমান হতে পারে না? এসব কেনর কি জবাব নেই? আর সে জবাব মানুষ মুখ দিয়ে উচ্চারণ না করলেও মনে মনে কি বোঝে না? অবশ্যই তা বোঝে। বোঝে দেশ ভাগ হওয়ার মূল কারণ থেকেই

বাংলাদেশ স্বাধীন হল, খুশী হল বাংলার মানুষ গণমানুষ। এটাই তো হওয়া উচিত। কিন্তু আমি যেহেতু ঐ সময় বন্দী হইনি তাই হাটে বাজারে গিয়ে তখন দেখেছি ভারতীয় টাকায় কেনা-বেচা হচ্ছে। তখন মুসলমান তা সে যুবকই হোক বা বয়স্কই হোক কারো মুখে হাসি দেখিনি। তারা বলত এটা তো শুভ লক্ষণ নয়। আর আমি নিজে স্বচক্ষে দেখেছি হিন্দুদের মনে কি ফূর্তি। লোকে যখন জিজ্ঞাসা করেছে যে এ কি! হিন্দুস্তানী টাকা কেন? তখন হাসতে হাসতে হিন্দুরা বলেছে-এখন তো বাংলাদেশ ভারত একই হয়ে গেল। এখন থেকে এই টাকাই চলবে।

কেউ কেউ মন্তব্য করেছেন- ভালই হল এখন বিনা পাসপোর্টে কলকাতা যাতায়াত করা যাবে। এ ধরনের অনেক মন্তব্য আমি নিজের কানে শুনেছি। এরপর আল্লাহর গায়েবী মদদ নাখিল হয়েছে। বডারটা বহাল রয়ে গেছে। নইলে আরো বহু পূর্বেই দশের লোক বুঝত যে দেশের একটা গ্রুপ কেন স্বাধীনতা বিরোধী ছিল। এবং কেন রাজাকার আল বদর বাহিনী গঠন করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তবে একথা ঠিক যে, আনাড়িদের নিয়ে রাজাকার নেয়ার কারণে রাজাকারে ঢুকেছিল দেশের যতসব চোর বদমাইশই বেশী। আমি এটা পূর্বেই বুঝেছিলাম, তাই আমার নিকট আত্মীয়ের কেউই রাজাকার ছিল না যদিও বাহিনীটার প্রয়োজন ছিল বলে আমি মনে করতাম।

islamirenesaandolon.blogspot.com

স্বাধীনতা লাভের মূলে কারা?

এ দেশের মুসলমান আজ কেউ কম্যুনিষ্ট, কেউ সমাজতন্ত্রী, কেউ, বা নিরপেক্ষবাদী, কেউ মধ্যমপন্থী, কেউ মৌলবাদী কেউ স্বাধীনতা রক্ষক , কেউ মুক্তিযোদ্ধ ইত্যাদি বহু নামে আজ এরা বিভক্ত। কিন্তু খুব বেশী দিনকার কথা নয়- এদেরই বাপ-দাদা যাদেরকে আমরা ৫০ বছর আগে দেখেছি তারা সবাই ছিলেন মৌলবাদী। এবং এ দেশে যখন স্বাধীনতা আন্দোলন হয় তখন সেই আন্দোলনের নামই ছিল পাকিস্তান আন্দোলন।

এ আন্দোলনে শরীক ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান স্বয়ং নিজেই। তাঁদের সেদিন চাণক্যনীতির শিকার হতে পারবঁ না এই দাবীতে শামিল ছিলেন তারাও যারা জানতেন যে আমাদের এলাকা কখনই পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হবে না। এবং পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয়ার কারণে সারাটা জীবন নয় শুধু বরং বংশানুক্রমে বাবুদের লাথি-চড় খেয়েই এ দেশে বাস করতে হবে। তারাও ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল। ভোট দিয়েছিল ভারতের প্রত্যেকটি এলাকার মুসলমান কারণ সে ভোটটা ছিল যে এ দেশের মুসলমান ধর্মীয় ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্র চায়? নাকি অখণ্ড ভারত চায়। সে নির্বাচনে যেমন ভোট দিয়েছিল আজকের ভারতের ৯৮% মুসলমান তেমনি ভোট দিয়েছিল আজকের বাংলাদেশীদের বাপ-মা, দাদা-দাদি, নানা-নানি সবাই। তার ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল দুই অঞ্চল নিয়ে একটা ধর্মভিত্তিক দেশ পাকিস্তান।

পাকিস্তান হওয়ার কারণেই পাক আমলের ২৫ বছর পরে আজকের বাংলাদেশ গড়ে উঠেছে। তখন গড়ে উঠেছিল কত নূতন নূতন রাস্তাঘাট বড় বড় বিল্ডিং। বড় বড় কল কারখানা। এবং কিছু ধনী লোক ভারতের অংশ থেকে চলে আসে বাংলাদেশে। তারা এটাকেই মেনে নেয় নিজের দেশ হিসেবে। শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণেই। এর পূর্বে এ ঢাকা শহরের মর্যাদা ছিল একটা জেলা শহরের মর্যাদামাত্র। আজকের সংসদ ভবন সেটাও তৈরী হয়েছে পাক আমলেই। এর পূর্বের সত্য কথা হচ্ছে এই যে, এই অঞ্চলের কোন মুসলমান পুলিশ বড় দারোগার উপরে কিছু হতে পারেনি। কেউ মেজর জেনারেলের পদও লাভ করতে পারেনি। সেক্রেটারীয়েটে কেউ সেকশন অফিসারের উপরে উঠতে পারেন নি। তাছাড়া বড় ধরনের কোন কল কারখানাও গড়ে উঠতে পারেনি।

islamirenesaandolon.blogspot.com

বিশ্বের সর্বাপেক্ষা বড় কাগজের মিলও এ এলাকায় গড়ে উঠতে পারত না যদি পূর্বেই দেশটা ভাগ হয়ে না থাকত। আর মুহাজির মুসলমানরা যদি এটাকে নিজের দেশ মনে না করত। পূর্বেই ধর্মের ভিত্তিতে দেশটা ভাগ হয়েছিল বলেই পরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি। যদি পূর্বেই ধর্মভিত্তিতে ভাগটা না হয়ে থাকত তা হলে কার সাধ্য ছিল এ অঞ্চলে একটা নূতন রাষ্ট্র গড়ার। যে রাষ্ট্রের সীমানা পড়েছে এমন জায়গা দিয়ে যে কারো রান্না ঘর এক দেশে আর থাকার ঘর অন্য দেশে। এ ভাগ হয়েছিল বলেই পরে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের মুখ আমরা দেখতে পাচ্ছি। এ ভাগটা হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে? এবং কাদের জীবন বিসর্জনের ফলে? তা কি এত সহজে এবং এত অল্প দিনের মধ্যে জাতি ভুলে যেতে পারে?

আর সেদিনও আমরা দেখছি কতিপয় নেতা ও কর্মীকে যারা করেছিল ভারত বিভক্তির বিরোধিতা। তার মধ্যে এ অঞ্চলের ছিলেন এক জন নাম করা ব্যক্তিত্ব। মরহুম সৈয়দ নওশের আলী, তাঁর সঙ্গে ঐ সময় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেন বেরইলের (মাগুরা থানার অধীন) মৌলভী আঃ আওয়াল সাহেব যিনি মাত্র এফ, এম পাশ ছিলেন (কলকাতা মাদ্রাসা থেকে)। অথচ নড়াইল ও মাগুরার একজন নামকরা নেতা হওয়া সত্ত্বেও জনাব নওশোর আলী (কংগ্রেস প্রার্থী) পেলেন মাত্র ৩ হাজার কত শতের মত ভোট। এত ভোট পাওয়ার অর্থ হল তিনি ছিলেন খুবই উচ্চ পর্যায়ের একজন কংগ্রেস নেতা। নইলে এর চেয়ে কম ভোট তিনি পেতেন।

আর পক্ষান্তরে মুসলিম লীগ প্রার্থী জনাব মরহুম মৌলভী আঃ আওয়াল সাহেব ভোট পেলেন প্রায় ৪০ হাজার। কংগ্রেস এরূপ ভোট পেয়েছিলেন যা শেষ পর্যন্ত দেখা গেল গোটা দেশে মুসলমানদের প্রায় ২% ভোট আর ৯৮% ভোট হল মুসলিম লীগের পক্ষে।

তখন বাংলার মুসলমান যারা মুসলিম লীগকে ভোট দিয়েছিলেন। তারা কারা ছিলেন? তাঁরা আজকের এই অমৌলবাদীদেরই বাপ-দাদা ছিলেন। কাজেই একটু হিসেব করে দেখা দরকার যে" এটা পূর্ব থেকেই পূর্ব পাকিস্তান না হয়ে থাকলে একটা স্বাধীন দেশের মুখ তাদের দেখতে হত না। এবং এখন মৌলবাদী বলে যাদের গালি দেয়া হচ্ছে তাদের মধ্যে ঐ অমৌলবাদীর পিতামাতাও শামিল রয়েছেন। এ কথা কেউ কি অস্বীকার করতে পারবে?

islamirenesaandolon.blogspot.com

আজ যারা মৌলবাদীদের গালাগালি দিচ্ছেন তারা যে তাদের বাপ-দাদাদেরই গালাগালি দিচ্ছেন তা কি তাঁরা একবারও ভেবে দেখেছেন।

প্রশ্ন ঃ ৭১ এর যুদ্ধ কি প্রকৃতই স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ পাকিস্তানের দুই অংশ এক সঙ্গে থাকলেও আমরা পরাধীন থাকতাম না এবং ভাগ হওয়ার পরেও আমরা পরাধিন নই-তবে আদর্শগত দিক থেকে পাক আমলকে অধিকতর ভাল মনে করত আর কেউ পরবর্তী আমলকে অধিকতর ভাল মনে করে। তাই বলে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দিক থেকে পূর্বের ও পরের অবস্থার মধ্যে কোন পার্থক্য আছে বলে কেউ মনে করে না। কারণ তখনও যা রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিল এখনও তাই আছে তবে শোনা যায় তখন কোন দাসখত ছিল না, পরে দাসখত হয়েছে। এইটুকু মাত্র পার্থক্য।

৭১-এর যুদ্ধকে আমাদের মত কিছু মূর্খ সাধারণ মানুষ, এমন কি কিছ মুক্তিফৌজও স্বাধীনতা যুদ্ধে মনে করেনি। আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কোন নজীর দেখিনি যে মাত্র ৯ মাসের আন্দোলনে কোন পরাধীন জাতি স্বাধীন হয়ে গেছে। আর এমন কোন নজীরও দেখিনি যে দেশের একটা দল মনে করে আমরা পরাধীন আর অন্য একটা দল মনে করে আমরা স্বাধীন। এ দেশের সেরা বুদ্ধিজীবিদের মধ্যেও যারা সেরা তারাও মনে করেননি যে আমরা পরাধীন।

যেমন বি, এন, পি আমলের প্রধান মন্ত্রী যিনি এককালে ছিলেন মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রধান সাগরদের অন্যতম তিনিও মনে করেননি যে আমরা পরাধীন, পাকিস্তান আমলে হাদিস গ্রুপের সর্বোচ্চ নেতা এবং একটা সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (ইউনিভারসিটি) প্রধান জনাব আঃ বারী সাহেব। তিনিও মনে করেননি যে আমরা পরাধীন। ডাঃ কাজী দ্বীন মোহাম্মদ সাহেব যিনি সেরা বুদ্ধিজীবিদের অন্যতম তিনিও মনে করেননি যে আমরা পরাধীন। এরূপ অনেকেই মনে করেননি যে আমরা পারাধীন। যেমন ৪৭ এর পূর্বে প্রত্যেকে মনে করত আমরা পরাধীন।

৭১-এর যুদ্ধের কারণ সম্পর্কে সবার বুঝ এক প্রকার ছিল না, কেউ বুঝেছিলেন এটা হচ্ছে এ দেশ থেকে ইসলামকে উৎখাত করার যুদ্ধ। কেউ বুঝেছিলেন এটা ন্যায্য অধিকার আদায়ের যুদ্ধ। কেউ বুঝেছিলেন এটা মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করে দেয়ার যুদ্ধ। আর কেউ বুঝেছিলেন আওয়ামী লীগে সর্বাধিক ভোট পাওয়ার পরেও কেন শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী হয়ে মন্ত্রী

islamirenesaandolon.blogspot.com

পরিষদ গঠন করতে দেয়া হচ্ছে না এজন্যে। প্রধানমন্ত্রীর পদটা কেড়ে নেয়ার জন্য এ যুদ্ধ। দেশের সাধারণ মানুষ মনে করত না যে আমরা পরাধীন।

তাছাড়া আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবীর মধ্যে একথা নেই যে এটা পরাধীন দেশ; এটা স্বাধীন করার জন্য এ ৬ দফা দাবী পেশ করা হল। ফলে ৭১-এর যুদ্ধে আমার মত অনেক নাদানই বুঝতে পারেনি যে এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ। বরং এ দেশের ইসলাম প্রিয় প্রতিটি মানুষই বুঝেছিল যে আমরা আবার হিন্দুদের গোলাম হতে যাচ্ছি। তাই দেশের লোক দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। আর সেজন্যেই ১৯৪৭-এর ১৪ ই আগষ্ট,৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরে একই ধরনের আনন্দের ভাব ফুটে ওঠেনি। যার সাক্ষী এ দেশের গণমানুষ। ১৪ ই আগষ্ট দেশটা আনন্দে ফেটে পড়েছিল আর ১৬ই ডিসেম্বর লুকিয়ে লুকিয়ে অনেকে চোখের পানি মুছতেছিল।

১৬ ই ডিসেম্বরের পর

শুনলে হয়ত অনেকের নিকটই বিস্ময়ের ব্যাপার মনে হতে পারে কিন্তু ব্যাপার সত্য। দীর্ঘদিনের আমার শিক্ষকতা জীবনের বহু ছাত্রই ভারত থেকে ফিরে এসে আমার কাছে বলেছে, স্যার যদি বুঝতাম যে পাকিস্তন ভেঙ্গে যাচ্ছে তাহলে কিছুতেই মুক্তিফৌজে নাম দিতাম না। আমি জিজ্ঞেস করেছি, তোমরা কি বুঝেছিলে? জবাবে বলেছে "আমরা বুঝেছিলাম-শেখ মুজিবকে কেন ক্ষমতা দিচ্ছে না সেই জন্যে আমরা লড়ছি। আর লড়ছি অধিকার আদায়ের জন্যে।"

প্রশ্ন ঃ আপনি বলতে চাচ্ছেন- 'মুক্তিযুদ্ধের হোতারা অধিকার আদায়ের কথা বলে দেশবাসীকে ভিন্ন দিকে পরিচালিত করেছে। বিচ্ছিন্নতা ও ইসলাম পন্থীদের নির্মূল করা তাদের লক্ষ্য ছিল? আপনার কাছে এর প্রমাণ আছে কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ তাই, এর প্রমাণও আছে।

(ক) এমন কিছু মুক্তিফৌজের নাম উল্লেখ করতে পারবো যারা বলেছিল যে আমরা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করেছি। আমরা অধিকার আদায়ের সংগ্রাম করছি। আমরা ইসলামকে উৎখাত করার কিংবা পাকিস্তানকে ভাঙ্গার আন্দোলন করিনি এবং সে জন্যে লড়াইও করিনি। কিন্তু পরিবেশ পরিস্থিতি পরে বাধ্য করেছে একথা বলতে যে আমরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছি। কিন্তু আসলে তা করিনি।

এমন লোকদের কিছু নাম ঠিকানা বলতে পারবো ইনশাল্লাহ। তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে দেখতে পারেন। আপনাকে একটা সহজ ঠিকানা

islamirenesaandolon.blogspot.com

বলে দেই আপনি ঢাকা মহানগরী জামায়াতে ইসলামীর অফিসে যান। গেলে নিশ্চয়ই কিছু লোক দেখতে পাবেন। আপনি দ্বিধাহীন চিত্তে তাদের জিজ্ঞেস করুন ভাই আপনারা কি কেউ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন? দেখবেন কেউ না কেউ বলবে যে হ্যাঁ, আমি এককালে মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম পরে জামায়াতে যোগদান করেছি। তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন আপনারা ৭১ এর যুদ্ধকে কিসের যুদ্ধ মনে করতেন, তখন আপনাকে কি বুঝান হয়েছিল? দেখবেন তারা অকপটে আপনার প্রশ্নের জবাব দিবেন বিশেষ করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের ৯ নং সেক্টরের সেক্টর কমান্ডার মেজর (আবঃ) জয়নুল আবেদীন সাহেবেকে জিজ্ঞেস করুন তাঁরা কিসের জন্য যুদ্ধ করেছেন। তাহলে ভাল উত্তর পাবেন। তিনি এখন বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলনের সভাপতি। এভাবে অনেক লোকের নাম বলতে পারবো যারা এটাকে অধিকার আদায়ের যুদ্ধ মনে করেছিলেন।

(খ) আমাদের এলাকা থেকে নির্বাচিত এম,পি, এ মরহুম সৈয়দ আতর আলী সাহেব (মাগুরা আওয়ামী লীগ নেতা) যিনি একই গ্রামের এবং আমার চাচা হতেন তিনি ঐ সময় একদিন বললেন, এবার যে কি হতে যাচ্ছে তা তোমরা জানবে কি করে? আমাদের দলেরও খুব কম লোকই জানে যে এটা কিসের যুদ্ধ।

(গ) সালিখা থানার আমার এক হিন্দু ছাত্র-যার গ্রামের নাম 'আসবা' বরইচারা হাই স্কুলে সে আমার ছাত্র ছিল। সে ঐ সময় কলাইভাঙ্গা গ্রামের ছোরমান বিশ্বাসের বাড়ী এসে আমার সঙ্গে দেখা করে বলল, স্যার আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছি।

আমি ঃ বল কি বলবে।

ছাত্র ঃ স্যার, আমি ভারতে বসে একটা লিস্ট তৈরী হতে দেখেছি। তাতে এ দেশের কিছু লোক মেরে ফেলার লিষ্ট হয়েছে যার মধ্যে আপনার নামও রয়েছে। আর রয়েছে কিছু সরকারী বড় বড় অফিসারের নাম- আর আছে উচ্চ শিক্ষিত কিছু মুসলমানের নাম। আমি যেহেতু নিজের চক্ষে এসব লিষ্ট দেখেছি তাই বলছি স্যার আপনি যদি ভালো মনে করেন তাহলে আপনাকে আমি ভারতে নিয়ে রেখে আসি। আপনি যেহেতু আমার শিক্ষক তাই আপনাকে এ কথাটা বলতে এসেছি। আপনি আমার সঙ্গে গেলে আপনাকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসব।

আমিঃ আল্লাহ যতদিন হায়াত রেখেছে ততদিন কেউ মারতে পারবেনা এ বিশ্বাস আছে কাজেই জীবন বাঁচাতে আমি ভারতে যাব না। তবে তোমার আন্তরিকতায় আমি খুশী এবং তোমাকে ধন্যবাদ।

islamirenesaandolon.blogspot.com

এভাবে নামের লিষ্ট হওয়ার কথা বহু লোকের নিকটে শুনেছি। একজন জোর দিয়ে বললেন, আমি আপনার নাম মাগুরার লিস্টের ১৭ নাম্বারে দেখছি। অবশ্য থাকার কথা ছিল ১নং এ। কিন্ত আল্লাহ বাঁচালে কেউ কাউকে মারতে পারে না, আর তিনি যদি কাউকে শাহাদতের মর্যাদা দিতে চান তবে সেটাও কেউ রদ করতে পারেনা। চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লার বহু আলেম ও আল্লাহ ভক্ত লোকদেরকে ঐ সময় মেরে ফেলে। তাদেরকে আল্লাহ শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছেন। তবে এসব জেলার যে সকল এলাকায় আলেমের সংখ্যা বেশী সেই এলাকায় দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গণহত্যা শুরু হয়ে গিয়েছিল। শেখ সাহেব দেশে ফিরে এটা রোধ করেন বলে অনেকের ধারণা।

প্রশ্ন ঃ শেখ সাহেব সম্পর্কে কয়েক ধরনের কথা সমাজে চালু আছে। কেউ বলেন তিনি অত্যন্ত হিন্দু ঘেঁষা ছিলেন, তাই হিন্দুদের কে দলে নিয়ে হিন্দু রাজ্যের অঙ্গ রাজ্য বানাতে চেয়েছিলেন। এভাবে এক এক গ্রুপের লোক এক এক ধরনের মন্তব্য করেন। এ ব্যপারে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ আমি দেশের দশকোটি মানুষের মধ্যে একটি মানুষ মাত্র। কাজেই আমার নিজের মন্তব্যের আর কতটুকু মূল্য থাকতে পারে। তবে অনেক বুদ্ধিজীবিদের মন্তব্যের সঙ্গে আমি এক মত। তাই যাদের মন্তব্যকে আমি সঠিকের কাছাকাছি মনে করি তাদের মন্তব্য কি তাই বলছি।

যারা মনে করেন শেখ সাহেব পুরোপুরি হিন্দু ঘেষা ছিলেন তাদের সঙ্গে আমি পুরাপুরি একমত নই। তিনি কিছুটা হিন্দু ঘেষা থাকলেও পুরাপুরি ছিলেন না এটা আমার ধারণা। আর যারা মনে করেন তিনি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন তবে অবস্থার চাপে তা ব্যক্ত করতে পারেননি। তিনি সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। হয়ত সুযোগ পেলে তিনি দেখাতেন যে তিনি হিন্দু ঘেঁষা নন। বরং মুসলিম ঘেঁষা ছিলেন। আমি একথার সঙ্গে অনেকখানি একমত। তিনি প্রথম দিকে এমন ভাব দেখাচ্ছিলেন যাতে হিন্দুরা মনে করেছিল শেখ সাহেব আমাদের দেবতা আর কম্যুনিষ্টরা মনে করেছিল শেখ সাহেবের মাধ্যমেই আমরা এ দেশ থেকে ইসলামকে উৎখাত করব এবং এ দেশের লোকদের নাস্তিক বানিয়ে ছাড়ব।

ভারত পন্থীরা মনে করেছিল এটাকে ভারতের অঙ্গরাজ্যে পরিণত করতে পারব আর রুশপন্থীরা ভেবেছিল এ দেশকে শেখ সাহেবের মাধ্যমে রাশিয়ার করদ রাজ্যে পরিণত করা যাবে। পরে শেখ সাহেব ৭২ এর ১০ই জানুয়ারী

islamirenesaandolon.blogspot.com

দেশে ফিরে আসলে অনেকেই গিয়ে দেখা করল অনেকেই তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে ওঁৎ পেতে রইল। তিনি লক্ষ্য করল। এদের মতলব তো ভালো না। তবুও তাকে দিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেয়া হল। অনেক কিছুর নাম থেকে ইসলামী নাম ছাটাই করা হল। হিন্দুয়ানী নাম বহাল করা হল।

তাকে কেউ কেউ বললেন, আমরা যুদ্ধের মাধ্যমে তো এ দেশ থেকে ইসলামকে উৎখাত করে দিয়েছি। এখন আর ইসলামী একাডেমীরই বা দরবার কি? ওটা তুলে দেয়া হোক। শেখ সাহেব ক্ষেপে গেলেন। বললেন, কী! ইসলাম একেবারেই থাকবেনা? আমি ইসলাম রাখব। তিনি ইসলামিক একাডেমীকে ইসলামী ফাউন্ডেশন করে ফেললেন। কেউ কেউ আবার পরামর্শ দিল, স্যার আপনি যদি ইসলাম রাখেনই তবে ইসলামকে নিজের হাতে নিয়ে নিন। ইসলামিক ফাউন্ডেশন করে তার পরিচালনার ভার আপনার আওয়ামী লীগের উপর দিয়ে দিন তাহলে ইসলাম আপনার আয়ত্বধীন চলে আসবে এবং আপনার ইচ্ছা মতই ইসলাম চলবে। ইসলামের ইচ্ছামত আপনাকে চলতে হবেনা।

তিনি তা বুঝে গেলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন করলেন। মদ নিষিদ্ধ করলেন, আলেম মৌলভীদের মেরে শেষ করতেছিল মুক্তিফৌজরা, তিনি তা বন্ধ করলেন। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল যে কোথাও মিলাদ পড়ানোর জন্য একজন আলেম পাওয়া যেত না। এমন কি দাঁড়ি টুপিওয়ালা লোকদেরকে এ দেশের শত্রু মনে করা হত এবং গেরুয়া বসন পরা লোকদেরকে এ দেশের বন্ধু মনে করা হতো। এতো দেশের লোক প্রত্যেকেই দেখেছে। আওয়ামী লীগের লোকেরাই দেশে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছিলো।

তখন মুক্তি বাহিনীর লোকেরা একই পিতার একাধিক সন্তানকে ঘর থেকে টেনে বের করে তাদের সামনেই জবাই করেছে এবং এতেই তারা আনন্দ পেয়েছে। পরে সেই মুক্তিফৌজদের অনেককেই মুজিব বাহিনীর লোকেরা মেরে ফেলেছে। এইটাই আল্লাহর বিচার।

প্রকৃতপক্ষে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন বিজয়ী দলের হাতে এসে গেল সর্বময় ক্ষমতা এবং পরাজিতরা যখন অস্ত্রশস্ত্র মুক্তিফৌজের হাতে দিয়ে দিল তখনই বা তখন থেকেই শুরু হল এক তরফা গণহত্যা। এটা যদিও শেখ সাহেব দেশে ফেরার পর কমলো তবুও একেবারে বন্ধ হল না। শেখ সাহেব তাড়াহুড়া করে অস্ত্র জমা চাইলেন এবং যতদুর সম্ভব কৌশল করে মুক্তিফৌজের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিলেন।

islamirenesaandolon.blogspot.com

তার পর থেকেই এই হত্যাকান্ড অনেকটা বন্ধ হয়ে যায়। শেখ সাহেব দেখলেন মুক্তিফৌজদের উপর নেতৃত্ব চালাচ্ছে হিন্দু নেতৃবৃন্দ। তখন তিনি ভিন্ন ব্যবস্থা করলেন এবং সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। ঐ সময় স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের দাবী ছিল বিচার করে অপরাধীদের ফাঁসি দেয়া হোক। কিন্তু শেখ সাহেব দেখলেন তাতে তার নিজের লোকেরই গলায় ফাঁসি পড়বে বেশি। কাজেই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে উভয় কূল রক্ষা করলেন। এবং তার নিজের লোকদেরকে ফাঁসির হাত থেকে বাঁচালেন।

সত্যই শেখ সাহেবের মধ্যে একটা বড় গুণ ছিল তা হচ্ছে তিনি আল্লাহকে যতটুকু না বিশ্বাস করতেন তার চাইতেও বেশি বিশ্বাস করতেন তার দলের লোকদের।

এবার পড়ে দেখুন শেখ সাহেবের সাথে একজন বিদেশী মহিলা সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার।

এই সাক্ষাতকারটা আমি সংগ্রহ করেছি নতুন ঢাকা ডাইজেস্টের নভেম্বর ১৯৮৯ সংখ্যা থেকে।

এই সাক্ষাতকার থেকে শেখ সাহেব সর্ম্পকে আরো কিছু স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে এবং সত্যিকারভাবে চেনা যাবে।

সাক্ষাতকার
শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে ওরিয়ানা ফালাচি
রোববার সন্ধ্যাঃ

আমি কোলকাতা হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করেছি। সত্যি বলতে কি, ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী তাদের বেয়োনেট দিয়ে যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার পর পৃথিবীতে আমার অন্তিম ইচ্ছা এটাই ছিল যে, এই ঘৃণ্য নগরীতে আমি আর পা ফেলবোনা। এরকম সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার সম্পাদকের ইচ্ছা যে, আমি মুজিবের সাক্ষাতকার গ্রহণ করি। ভুট্টো তাকে মুক্তি দেবার পর আমার সম্পাদকের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল। লোকজন মুজিবের কথা বলা বলি করছিল। তিনি কি ধরণের মানুষ? আমার সহকর্মীরা স্বীকৃতি দিলো, তিনি মহান ব্যক্তি, সুপারম্যান। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশকে সমস্যামুক্ত করে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমার স্মরণ হলো ১৮ই ডিসেম্বর আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন লোকজন বলছিল,"মুজিব থাকলে সেই নির্মম, ভয়ঙ্কর ঘটনা কখনোই ঘটতো না। মুজিব প্রত্যাবর্তন করলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটবে না।" কিন্তু গতকাল মুক্তিবাহিনী কেন আরো ৫০জন নিরীহ বিহারীকে হত্যা করেছে?'টাইম' ম্যাগাজিন কেন বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে হেডলাইন করেছে-"মহান ব্যক্তি না বিশৃংখলার নায়ক?"

আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে সাংবাদিক অ্যলডো শানতিনিকে এক সাক্ষাতকারে বলেছিলেন, "আমার দেশে আমি সবচেয়ে সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ, আমি বাংলার বাঘ, দিকপাল- এখানে যুক্তির কোন স্থান নেই।" আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমার কি ভাবা উচিত।

সোমবার বিকেল

আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এবং আমার দ্বিধাদ্বন্ধ দ্বিগুণের অধিক। ঘটনাটা হলো,আমি মুজিবকে দেখেছি। যদিও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। সাক্ষাতকার নেয়ার পূর্বে তাকে এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এই কয়েকটা মুহূর্তই আমার চিত্তকে দ্বিধা ও সংশয়ে পুর্ণ করতে যথেষ্ট ছিল। যখন ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করি, কার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল? তিনি আর কেউ নন, মিঃ সরকার। তাঁকে দেখলাম রানওয়ের মাঝখানে। আম ভাবিনি, কেন? সম্ভবত এর চেয়ে ভালো কিছু তার করার ছিল না।

আমাকে দেখামাত্র জানতে চাইলেন যে, আমার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন কিনা? তাকে জানালাম যে, তিনি আমাকে মুজিবের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেন কিনা? তিনি সোজা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পনের মিনিটের মধ্যে আমরা একটা গেট দিয়ে প্রবেশ করে দেখলাম মুজিবের স্ত্রী খাচ্ছেন। সাথে খাচ্ছে তার ভাগনে ও মামাত ভাই বোনেরা। এদেশে খাওয়ার পদ্ধতি এরকমই।

মুজিবের স্ত্রী আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। আমার কাঁধে তার হস্ত স্থাপন করায় আমার জ্যাকেটে কড়াভাবে তার তৈলাক্ত আঙ্গুলের ছাপ পড়ে গেল, যা ড্রাই ক্লিনিং করেও উঠানো যাবেনা। এরপর তিনি সমানে কথা বলতে শুরু করলেন। যার একটা শব্দও আমার বোধগম্য হয়নি।

ঠিক তখনই মুজিব এলেন। সহসা রান্নাঘরের মুখে তার আবির্ভাব হলো। তার পরনে চোগার মত এক ধরনের সাদা পোশাক, যাতে আমার কাছে মনে হয়েছিল একজন প্রাচীন রোমান হিসাবে। চোগার কারণে তাকে দীর্ঘ ও ঋজু মনে হচ্ছিল। তার বয়স একান্ন হলেও তিনি সুপুরুষ। ককেশীয় ধরনের সুন্দর

islamirenesaandolon.blogspot.com

চেহারা। চশমা ও গোঁফে সে চেহারা হয়েছে বুদ্ধিদীপ্ত। যে কারো মনে হবে, তিনি বিপুল জনতাকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। কিন্তু আট মাসের বন্দি জীবন এবং যে ভোগান্তির কথা তিনি দাবী করেন তা চেহারা দেখে অল্পই আচঁ করা যায়। পাকিস্তানীরা নিশ্চয়ই তাকে ভালোভাবে খেতে দিয়েছে।

আমি সোজা তার কাছে গিয়ে পরিচয় পেশ করলাম এবং আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলাম। মিঃ সরকার ভূমিতে পতিত হয়ে মুজিবের পদচুম্বন করলেন এবং ধীরে ধীরে পা, নিতম্ব বেয়ে কাঁধ পর্যন্ত উঠে তা আকঁড়ে থাকলেন। আমার প্রতি তার কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। আমি বোবার মত দাঁড়িয়ে আছি। অতঃপর সরকার তার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে তার পায়ের আঙ্গুলের ডগা চুম্বন করলেন। আঙ্গুলগুলো স্যান্ডেলের সম্মুখ ভাগ দিয়ে বের হয়ে ছিল। আমি বাধা দিলাম। কারণ আমার ধারণা হয়েছিল মিঃ সরকার এই প্রক্রিয়াটা অব্যহত রাখলে কোন অসুখে আক্রান্ত হতে পারেন।

আমি মুজিবের হাতটা আমার হাতে নিয়ে রাখলাম। "এই নগরীতে আপনি ফিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত. যে নগরী আশংকা করছিল যে আপনি আর কোনদিন এখানে ফিরবেন না।"

তিনি আমার দিকে তাকালেন একুট উস্মার সাথে। একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, "আমার সেক্রেটারীর সাথে কথা বল।" এরপর মিঃ সরকারের শরীরটা ডিঙ্গিয়ে খাওয়ার টেবিলে চলে গেলেন। মিঃ সরকার তখন যেন ফ্লোরের সাথে মিশে আছেন।

আমার দ্বিধা ও সন্দেহের কারণ উপলব্ধি করা সহজ। মুজিবকে আমি জেনে এসেছি একজন গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী হিসেবে। যখন আমি দম নিচ্ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে এসে বললো, সে ভাইস সেক্রেটারী। বিনয়ের সাথে সে প্রতিশ্রুতি দিলো, বিকেল চারটার সময় আমি "হোয়াইট হাউজে" হাজির থাকতে পারলে আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হবে। মুজিবের সরকারী বাসভবনের নাম "হোয়াইট হাউজ" তার সাথে যারা সাক্ষাত করতে চায় তাদের সাথে সেখানেই তিনি কথা বলেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় নগরী ক্লান্ত, নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত-মধ্যাহ্নের বিশ্রাম নিচ্ছে। রাস্তায় কাঁধে রাইফেল ঝুলানো মুক্তিবাহিনী টহল দিচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে এক মাসেরও বেশী সময় আগে। কিন্তু এখনো তাদের হাতে অস্ত্র আছে। তারা রাতদিন টহল দেয়। এলোপাথাড়ি বাতাসে গুলি ছুঁড়ে এবং মানুষ হত্যা করে। হত্যা না করলে দোকানপাট লুট করে। কেউ তাদের থামাতে পারেনা। এমনকি মুজিবও না। সম্ভাবত তিনি তাদের থামাতে সক্ষম নন। অথবা এই কর্মকান্ডের পরিসমাপ্তি ঘটানোর কোন

islamirenesaandolon.blogspot.com

ইচ্ছা তার নেই। তিনি সন্তুষ্ট এ জন্যে যে, নগরীর প্রাচীর তার পোষ্টার সাইজের ছবিতে একাকার। অদ্ভুত, মুজিবকে আমি আগে জেনেছিলাম, তার সাথে আমার দেখা মুজিবকে মিলাতে পারছিনা। ইনি কি কেসিয়াস ক্লে?

সোমবার সন্ধ্যা

না তিনি কেসিয়াস ক্লে হতে পারেন না। যদিও তার সাথে অনেক সাদৃশ্য রয়েছে। তাকে মুসোলিনীর মত মনে হয়। একই মনোভাব এবং অভিন্ন তার প্রকাশ। একইভাবে মনে হবে যেন শক্ত চোয়াল ভেদ করে চিবুকটা বেরিয়ে আছে। এমনকি কণ্ঠস্বর ও একই রকম। দু'জনের মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হলো, মুসোলিনী যে একজন ফ্যাসিস্ট তা তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু মুজিব তা লুকিয়ে রেখেছেন- মুক্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সাম্যের মুখোশের অন্তরালে। আমি যে তার সাক্ষাতকার নিয়েছি- এটা ছিল এক দূর্বিপাক। তার মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল তিনি কি উন্মাদ ? এমন কি হতে পারে যে, কারাগার এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভীতি তার মস্তিস্কে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে? তার ভারসাম্যহীনতাকে আমি আর কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারিনা। একই সময় আমি বলতে চাচ্ছি কারাগার এবং মৃত্যু ভয় ইত্যাদি.. সম্পর্কে কাহিনীগুলো .. আমার কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়। এটা কি করে হতে পারে যে, তাকে যে রাতে গ্রেফতার করা হলো ? যে রাতে সকল পর্যায়ের লোককে হত্যা করা হলো? কি করে সম্ভব যে, এত কান্ডের মধ্যে তার এবং তার পরিবারের কারো কেশাগ্র বা মাথা স্পর্শ করা হলোনা? কি করে এটা হতে পারে যে তাকে কারাগারের একটি প্রকোষ্ঠ থেকে পলায়ন করতে দেয়া হলো, যেটি তার সমাধি সৌধ হতো? তিনি কি গোপনে ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? তার কাছে কিছু একটা রয়েছে যা সত্য নয় আমি যত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি তত মনে হয়েছিল একটা কিছু লুকাচ্ছেন এমন কি তার মধ্যে যে সার্বক্ষণিক আক্রমণাত্মক ভাব সেটাকে আমার মনে হয়েছে আত্মরক্ষার কারণ।

ঠিক চারটায় আমি হোয়াইট হাউজে ছিলাম। ভাইস সেক্রেটারী আমাকে করিডোরে বসতে বললেন, যেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোক ঠাসাঠাসি ছিল। তিনি অফিসে প্রবেশ করে মুজিবকে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানালেন। আমি একটা ভয়ঙ্কর গর্জন শুনলাম এবং নিরীহ লোকটি কম্পিতভাবে পূনরায় আবির্ভূত হয়ে আমাকে প্রতীক্ষা করতে বললেন। আমি প্রতীক্ষা করলাম। এক ঘন্টা, দুই ঘন্টা, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা-রাত আটটা যখন বাজল, তখনো আমি অপরিসর করিডোরে অপেক্ষামান। রাত সাড়ে আটটায় অলৌকিক ঘটনা-ঘটলো-মুজিব আমাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমাকে প্রবেশ করতে বলা হলো। আমি বিশাল কক্ষে প্রবেশ করলাম। একটি সোফা ও দুটো চেয়ার সে কক্ষে। মুজিব সোফার পুরোটায় নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং দু'জন মোটা মন্ত্রী চেয়ার দুটো দখল করে বসে আছেন তাদের বিপুল বাতাসে ছড়িয়ে। কেউ দাঁড়ালোনা। কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানালোনা। কেউ আমার উপস্থিতেকে গ্রাহ্য করলোনা। মুজিব আমাকে বসতে বলার সৌজন্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত সুদীর্ঘক্ষণ নিরবতা বিরাজ করছিল।

আমি সোফার ক্ষুদ্র প্রান্তে বসে টেপ রেকর্ডার খুলে প্রথম প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি কিন্তু আমার সে সময়ও দিল না। মুজিব চিৎকার শুরু করলেন, হ্যারি আপ, আন্ডারষ্ট্যান্ড? নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?... পাকিস্তানীরা ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করেছে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার ইয়েস থ্রি থ্রি থ্রি (তিনি কি করে এই সংখ্যাটা স্থির করলেন, আমি কখনো তা বুঝবো না। ভারতীয়রা নিহতের সংখ্য দিয়েছে তা কখনো দশ লক্ষের কোঠা অতিক্রম করেনি।) আমি বললাম, "মিঃ প্রাইম মিনিস্টার ...।" মুজিব আবার চিৎকার শুরু করলেন,"ওরা আমার নারীদেরকে তাদের স্বামী ও সন্তানদের সামনে নাতিকে, নাতির সামনে দাদা দাদীকে, ভাইবোনদের সামানে ভাইবোনকে, চাচার সামনে চাচীকে, শালার সামনে শালীকে ..." মিঃ প্রাইম মিনিস্টার আমি বলতে চাই.." "তোমার কোন কিছু চাওয়ার অধিকার নেই, ইজ দ্যাট রাইট?"

আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো তাকে নরকে প্রেরণ ও প্রস্থান। কিন্তু একটা বিষয় সম্পর্কে আমি আরো কিছু জানতে চাই। বিষয়টা আমি বুঝতে পারছিলাম না। " মিঃ প্রাইম মিনিস্টার গ্রেফতারের সময় কি আপনার উপরে নির্যাতন করা হয়েছিল?"

"নো ম্যাডাম নো। তারা জানতো, ওতে কিছু হবেনা। তারা আমার বৈশিষ্ট্য, আমার শক্তি, আমার সম্মান, আমার মূল্য, বীরত্ব সর্ম্পকে জানতো, আন্ডারস্টান্ড?"

"তা বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে তারা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে? ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা হয়?

"নো, নো ডেথ সেন্টেন্স।"

islamirenesaandolon.blogspot.com

এই পর্যায়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো এবং তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন," আমি এটা জানতাম। কারণ ১৫ ডিসেম্বর ওরা আমাকে কবর দেয়ার জন্য একটা গর্ত খনন করে।"

"কোথায় খনন করা হয়েছিল সেটা?"

"আমার সেলের ভিতরে।"

"আমাকে কি বুঝে নিতে হবে যে গর্তটা ছিল আপনার সেলের ভিতরে?"

"ইউ মি আন্ডারস্ট্যান্ড।"

"আপনার প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছিল মিঃ প্রাইম মিনিস্টার?"

"আমাকে একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল। এমনকি আমাকে সাক্ষাতকারের অনুমতি দেয়া হতো না, সংবাদপত্র পাঠ করতে বা চিঠিপত্র দেয়া হতো না, আন্ডারস্যান্ড?"

"তাহলে আপনি কি করেছেন?"

"আমি অনেক চিন্তা করেছি, বহু পড়াশুনা করেছি।"

"আপনি কি পড়েছেন?"

"বই এবং অন্যান্য জিনিস।"

"হ্যাঁ, কিছু পড়েছেন।"

"হ্যাঁ, কিছু পড়েছি।"

"কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল আপনাকে কোন কিছুই পড়তে দেয়া হয়নি।"

" ইউ সি আন্ডাস্ট্যান্ড।"

"তা বটে মিঃ প্রাইম মিনিস্টার। কিন্তু এটা কি করে হলো যে, শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলালো না।"

"জেলার আমাকে সেল থেকে পালাতে সহায়তা করেছেন এবং তার বাড়ীতে আশ্রয় দিয়েছেন।"

"কেন তিনি কি নির্দেশ পেয়েছিলেন?"

"আমি জানি না। তার সাথে আমি কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার সাথে কিছু বলেননি।"

"নিরবতা সত্বেও কি আপনারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন?"

islamirenesaandolon.blogspot.com

"হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে সাহায্য করতে চান।"

"তাহলে আপনি তার সাথে কথা বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ, আমি তার সাথে কথা বলেছি।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি কারো সাথেই কথা বলেননি।"

"ইউ সি আন্ডারস্ট্যান্ড।"

"তা মিঃ প্রাইম মিনিস্টার। যে লোকটি আপনার জীবন রক্ষা করলো আপনি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন না?"

"এটা ছিল ভাগ্য, আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি।"

এরপর তিনি ভুট্টো সর্ম্পকে কথা বললেন। এ সময় তার কথায় কোন স্ববিরোধিতা ছিলনা। বেশ সতর্কতার সাথেই বললেন তার সম্পর্কে। আমাকে মুজিব জানালেন যে, ২৬শে ডিসেম্বর ভুট্টো তাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তাকে রাওয়ালপিন্ডিতে নেয়া। তার ভাষায়, "ভুট্টো একজন ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করলেন। তিনি সত্যিই ভদ্রলোক।"ভূট্টো তাকে বলেছিলেন যে, একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য মুজিব ব্লাক আউট ও যুদ্ধ বিমানের গর্জন থেকে বরাবরই যুদ্ধ সম্পকে আচ করেছেন। ভুট্টো তার কাছে আরো ব্যাখ্য করলেন যে, এখন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং তার কিছু প্রস্তাব পেশ করতে চান।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম "কি প্রস্তাব মিঃ প্রাইম মিনিস্টার?" তিনি উত্তর দিলেন, "হোয়াই শুড আই টেল ইউ? এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রাইভেট অ্যাফেয়ার।"

"আমার কাছে বলার প্রয়োজন নেই মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, আপনি বলবেন ইতিহাসের কাছে।''

মুজিব বললেন, "আমি ইতিহাস। আমি ভুট্টোকে থামিয়ে বললাম যদি আমাকে মুক্তি দেয়া না হয়, তাহলে আলাপ করবোনা। ভুট্টো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উত্তর দিলেন, আপনি মুক্ত; যদিও আপনাকে শীঘ্র ছেড়ে দিচ্ছিনা। আমাকে আরো দুই বা তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে। এর পর ভুট্টো পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তার পরিকল্পনা তৈরী করতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি অহংকারের সাথেই জানালাম দেশবাসীর সাথে আলোচনা না করে

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমি কোন পরিকল্পনা করতে পারিনা।" এই পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে তো কেউ বলতেই পারে যে, আপনাদের আলোচনা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয়েছিল।"

"তা তো বটেই। আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানি। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। কিন্তু তা হয়েছিল আমার জানার আগে যে পাকিস্তানীরা আমার জনগণের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত নিপীড়ন করেছে। আমি জানতাম না যে, তারা সন্তানের সামানে মাকে, পুত্রের সামানে পিতাকে, পিতার সামনে পুত্রকে, দাদার সামনে নাতীকে হত্যা করেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি তাকে থামিয়ে বললাম, "আমি জানি মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, আমি জানি।"

তিনি গর্জে উঠলেন,"এসব কিছুই জানো না; চাচার সামনে চাচীকে শালার সামনে ভাইকে হত্যা করেছে। আমি তখন জানতাম না যে, তারা আমার স্থপতি, আইনবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, চকিৎসক, আমার চাকরকে হত্যা করেছে এবং আমার বাড়ী, জমি সম্পত্তি ধ্বংস করেছে, আর...।"

তিনি যখন তার সম্পত্তির অংশে পৌছলেন, তার মধ্যে এমন একটা ভাব দেখা গেল, যা থেকে তাকে এই প্রশ্নটা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম যে, তিনি সত্যিই সমাজতন্ত্রী কি না? তিনি উত্তর দিলেন "হ্যাঁ...।" তার কণ্ঠে দ্বিধা। তাকে আবার বললাম যে, সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বুঝেন? তিনি উত্তর দিলেন,"সমাজতন্ত্র"। তাতে আমার মনে হলো, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা নেই। এর পরই অবতারণা হলো নাটকের।

১৮ই ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়লেন। নীচের অংশটুকু আমার টেপ থেকে নেয়াঃ

"ম্যাসাকার? হোয়াই ম্যাসাকার?"

"ঢাকা স্টেডয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি।"

"মিঃ প্রাইম মিনিস্টার,আমি মিথ্যাবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকান্ড প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি চাইলে আমি আপনাকে তার ছবিও দেখাবো। আর পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।

মিথ্যাবাদী, ওরা মুক্তি বাহিনী নয়।

islamirenesaandolon.blogspot.com

মিঃ প্রাইম মিনিস্টার। দয়া করে মিথ্যাবাদী শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনিফর্ম পরা ছিল।

"তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল, যারা প্রতিরোধের বিরোধিতা করেছিল এবং কাদের সিদ্দিকী তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হয়েছে।"

"মিঃ প্রাইম মিনিস্টার, কেউ প্রমাণ করেনি যে, লোকগুলো রাজাকার ছিল এবং কেউই প্রতিরোধের বিরোধিতা করেনি। তারা ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। হাত পা বাঁধা থাকায় নড়াচড়াও করতে পারছিলনা।"

"মিথ্যাবাদী"।

"শেষ বারের মত বলছি, আমাকে মিথ্যাবাদী বলার অনুমতি আপনাকে দেবোনা।"

"আচ্ছা সে আবস্থায় এমন কি করতে?"

"আমি নিশ্চিত হতাম যে, ওরা রাজাকার ও অপরাধী। ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতাম এবং এভাবে এই ঘৃণ্য হত্যাকান্ড এড়াতাম।"

"ওরা ওভাবে করেনি। হয়তো আমার লোকদের কাছে বুলেট ছিল না।"

"হ্যাঁ, তাদের কাছে বুলেট ছিল। প্রচুর বুলেট ছিল। এখনো তাদের কাছে প্রচুর রয়েছে। তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গুলি ছোড়ে। ওরা গাছে, মেঘে, আকাশে, মানুষের প্রতি গুলি ছোঁড়ে শুধু আনন্দ করার জন্য।"

সোমবার রাত

গোটা ঢাকা শহর জেনে গেছে যে, মুজিব ও আমার মধ্যে কি ঘটেছে। শমসের ওয়াদুদ নামে একজন লোক ছাড়া আমার পক্ষে আর কেউ নেই। লোকটি মুজিবের বড় বোনের ছেলে। এই যুবক নিউইর্য়ক থেকে এসেছে তার মামার কাছে। তার সাথে একটা বাসন মোছার ন্যাকাড়ার মত আচরণ করা হয়েছে। সে আরো বললো যে, মুজিব ক্ষমতালোভী এবং নিজের সর্ম্পকে অতি উচ্চ ধারণা সম্পন্ন অহংকারী ব্যক্তি।

তার মামা খুব মেধা সম্পন্ন নয়। বাইশ বছর বয়সে মুজিব হাইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করেছেন। আওয়ামী লীগ সভাপতির সচিব হিসাবে তিনি রাজনীতে প্রবেশ করেন। এছাড়া আর কিছু করেন নি তিনি। কেউ কল্পনা করতে পারেনি যে, মুজিব একদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওয়াদুদের মতে আত্মীয়স্বজনের সাথে দুর্ব্যহারের কারণ এটা নয়।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আসলে একমাত্র ওয়াদুদের মাকেই মুজিব ভয় করেন। এই দুঃখজনক আচরণের জন্য তিনি পারিবারিকভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। সে আরো জানালো যে আমার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা সে তার মাকে জানাবে, যাতে তিনি এ ব্যাপারে মুজিবের সাথে কথা বলেন। সে আমাকে আরো বললো, সরকারী দফতরে গিয়ে এ ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ করা উচিত এবং প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলা উচিত। কারণ প্রেসিডেন্ট খাঁটি ভদ্রলোক।

মুজিব সম্পকে সংগৃহিত তথ্যাবলী তার জন্য বিপর্যয়কর। ১৯৭১ এর মার্চে পাকিস্তানীদের দ্বারা সংঘঠিত হত্যাকান্ডের কিছুদিন পূর্বে ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টো ঢাকায় এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খান যথাশীঘ্র ফিরে যান। কিন্ত ভুট্টো ঢাকায় রয়ে যান। তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাখা হয়। তার অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ৯১১-৯১৩। কেউ কি ধারণা করতে পারি কে তার গাইড ছিলেন? সে লোকটি শেখ মুজিবুর রহমান। এখন তাকে বলা হয় মুজিব।

দু'জন বরাবর একত্রে ছিলেন অবিচ্ছেদ্য। ঠিক দু'জন প্রেমিক প্রেমিকার মত। হোটেল অ্যাপার্টমেন্টে তারা হুইস্কি ও স্ন্যাকসের অর্ডার দিতেন এবং সব সময় হাসতেন। একদিন তারা নৌকা যোগে পিকনিকেও গেছেন। তারা যদি শত্রুই হবেন,তাহলে এসব হয় কি করে? এরপর ২৫শে মার্চ রাত ১০টায় মুজিব নিখোঁজ হয়ে গেলেন এবং ট্রাজেডির শুরু হলো।

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সবোর্চ্চ তলায় তখন ভুট্টোর ভুমিকা ছিল নিরোর মত। নগরী যখন জ্বলছিল এবং এলো পাথারি গুলিবর্ষণ চলছিল ভুট্টো তখন মদ পান করছিলেন আর হাসছিলেন। পরদিন সকাল ৭টায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। কিন্তু যাওয়ার আগে একটি টেলিফোনে মুজিবের নাম উল্লেখ করেন। তিনি কি নিশ্চিত হতে চাইছিলেন, যাতে তার বন্ধুর কোন অমঙ্গল না ঘটে। এ সত্যটা ঢাকায় সব সময় সুস্পষ্ট ছিল। আমি দেখেছি, যারা এক সময় পাকিস্তানীদের ভয়ে ভীত ছিল, তারা এখন মুজিবকেই ভয় করে।

গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচুর কথাবার্তা চলে এদেশে। কিন্তু সব সময় তা বলা হয ফিসফিসিয়ে,ভয়ের সঙ্গে। লোকজন বলাবলি করে যে, এই সংঘাতে মুজিব খুব সামান্য হারিয়েছেন। তিনি ধনী ব্যক্তি। অত্যন্ত ধনবান। তার প্রত্যাবর্তনের পর দিন তিনি সাংবাদিকদেরকে হেলিকপ্টার দিয়েছিল। কেউ কি জানে কেন? যাতে তারা নিজেরা গিয়ে মুজিবের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অবলোকন করে আসতে পারে। এখনো তিনি সমাজতন্ত্রের কথা

islamirenesaandolon.blogspot.com

বলেন। আসলে তিনি ভান করেন। তিনি কি তার জমিজমা, বাড়ী, বিলাস বহুল ভিলা, মার্নিডিজ গাড়ি জাতীয়করণ করবেন?

মুখোশ উন্মোচন করে মুজিব স্বীকার করুক, কে তার বন্ধু-বৃটিশ এবং মার্কিনীরা? যখন তিনি কোন বৃটিশ বা আমেরিকানের সাথে সাক্ষাত করেন তখন তিনি লন্ডন গেলেন কেন? "করাচী ও তেহরানের মধ্যে কোন যোগযোগ ছিলনা"- এটা সত্য নয়। তিনি এথেন্স বা তেহরান যেতে পারতেন এবং সেখান থেকে ভারতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ৫২ মিনিটের পরিবর্তে ২৪ ঘন্টা কাটাতে পারতেন।

ভুট্টোর সাথে মুজিবের প্রথম সাক্ষাত হয় ১৯৬৫ সালে, যখন তিনি ভারতের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তকে অরক্ষিত রাখার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন। একজন নেতা হিসাবে তার মূল্য ছিল খুব কম। তার একমাত্র মেধা ছিল মুর্খ লোকদের উত্তেজিত করে তোলার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন কথা মালা ও মিথ্যার যাদুকর... চরম মিথ্যা।

কিছুদিন আগে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন, করাচীর রাস্তাগুলো সোনা দিয়ে মোড়া। তা দিয়ে হাঁটলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

অর্থনীতির কিছুই বুঝতেন না তিনি। কৃষি ছিল তার কাছে রহস্যের মতো। রাজনীতি ছিল প্রস্তুতি বিহীন কেউ কি জানে ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি কেন বিজয়ী হয়েছিলেন? কারণ সব মাওবাদীরা তাকে ভোট দিয়েছিল। সাইক্লোনে মাওবাদীদের অফিস বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং তাদের নেতা ভাসানী আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

জনগণকে যদি পুনরায় ভোট দিতে বলা হয়, তাহলে মুজিবের অবস্থা সম্পূর্ন ভিন্নতর হবে, যদি তিনি বন্দুকের সাহায্যে তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে না চান। সে জন্যেই তিনি মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পনের নির্দেশ দিচ্ছেন না। এবং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্তপিপাসু কসাই, যে ঢাকা ষ্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল, সেই আবদুল কাদের সিদ্দিকী তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। ভারতীয়রা তাকে গ্রেফতার করেছিল; কিন্তু মুজিব তাকে মুক্ত করেন।

এখন আমরা গণতন্ত্রের কথায় আসতে পারি। একজন মানুষ কি গণতন্ত্রী হতে পারে, যদি সে বিরোধীতা সহ্য করতে না পারে? কেউ যদি তার সাথে একমত না হয়, তিনি তাকে "রাজাকার"বলেন। বিরোধীতার ফল হতে পারে ভিন্নমত পোষণকারীকে কারাগারে প্রেরণ। তার চরিত্র একজন একনায়কের, অসহায় বাঙ্গালীরা উত্তপ্ত পাত্র থেকে গণগণে অগ্নিকুন্ডে পতিত হয়েছে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

বাঙ্গালী রমণীদের সম্মান জানিয়েই বলছি, তাদের সর্ম্পকে কথা না বলাই উত্তম। তিনি নারীদের পাত্তাই দেন না।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে আবার মুজিবের সাথে দেখা করতে বললেন। সব ব্যবস্থা পাকা।

প্রেসিডেন্ট যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা খুব একটা সফল হয়নি। তিনি দু'জন কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তার নির্দেশ পালন করা হয়। মুজিবের কাছে একটা হুংকার ছাড়া তারা কিছু পায়নি। তবে এবার একটা করিডোরের বদলে একটা কক্ষে অপেক্ষা করার অনুমতি পেলাম। আমি বিকাল ৪টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। একজন বয় আমার চায়ের কাপ পূর্ণ করে দিচ্ছিল এবং এভাবে আমি আঠার কাপ চা নিঃশেষ করলাম। উনিশ কাপের সময় আমি চা ফ্লোরে ছুঁড়ে ফেলে হেঁটে বেরিয়ে এলাম।

আমাকে অনুসরণ করে হোটেলে এলো মুজিবের সেক্রেটারী ও ভাইস সেক্রেটারী। তারা বললো, মুজিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় আমার সাথে দেখা করতে চান। ইতিমধ্যেই ঢাকায় শেখ মুজিবের উপনাম 'শিট মুজিব (Shit ujib) ছড়িয়ে পড়েছিল। নাম আমার দেয়া।

পরদিন সকালে ঠিক সাতটায় আমি হাজির হলাম এবং সকাল সাড়ে ন'টায় মার্সিডিজ যোগে মুজিবের আগমন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। একটা কথাও না বলে তিনি অফিসে প্রবেশ করলেন আমিও অফিসে ঢুকলাম। আমার দিকে ফিরে তিনি উচ্চারণ করলেন,"গেট আউট"।

আমি কক্ষ থেকে বেরিয়ে যেতে উদ্যত। তিনি বললেন "গেট ইন হিয়ার"

আমি ফিরলাম এবং তখনই তিনজন লোক পোষ্টার আকৃতির একটি ছবি নিয়ে এলো। দেখে তিনি বললেন, "চমৎকার।"

এর পর তিনি বললেন, এই মহিলা সাংবাদিককে দেখাও। আমি চমৎকার শব্দটি উচ্চারণ করলাম। এ ছিল এক মারাত্মক ভুল। তিনি বজ্রের মতো ফেটে পড়লেন। তিনি ক্ষিপ্ত। ছবিটি ফ্লোরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, এ চমৎকার নয়। আমি কিছু না বুঝে নিশ্চুপ থাকলাম।

আমি তার উত্তেজনা হ্রাস করতে সক্ষম হলাম। যেহেতু আমি ভুট্টোর সাথে তার সত্যিকার সর্ম্পকটা খুঁজে পেতে চাই, সেজন্য ভুট্টো সম্পর্কে প্রশ

islamirenesaandolon.blogspot.com

করলাম। নামটা বলার মুহূর্তেই তিনি জ্বলে উঠলেন এবং বললেন যে, তিনি শুধু বাংলাদেশের ভবিষ্যত সর্ম্পকে প্রশ্নের উত্তর চান। আমি প্রশ্ন করলাম, "বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করার সম্ভাবনা আছে কিনা?"

খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে তিনি বললেন," এ সময় আমার আর কোন আগ্রহ নেই।"

এ বক্তব্য ইন্দিরা গান্ধীকেও বিস্মিত হতে হবে যে, মুজিব কোলকাতা করায়ত্ব করতে চায়! আমি বললাম, তার মানে আপনি বলতে চান, অতীতে আপনার আগ্রহ ছিল, এবং ভবিষ্যতে পুনঃ বিবেচনা করার সম্ভাবনা আছে।"

ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমি তাকে একটা ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছি। নিজের ভুল সংশোধন করার বদলে তিনি টেবিলে মুষ্টাঘাত করে বলতে শুরু করলেন যে, আমি সাংবাদিক নই বরং সরকারী মন্ত্রী। আমি তাকে প্রশ্ন করছি না দোষারোপ করছি। আমাকে এখনই বের হয়ে যেতে হবে এবং পুনরায় আমি যেন এদেশে পা না দেই।

এ পর্যায়ে আমি নিজের উপর সকল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম এবং আমার মাঝে উত্তেজনার যে স্তুপ গড়ে উঠেছিল তা বিস্ফোরিত হলো। আমি বললাম যে, তার সবকিছু মেকি, ভুয়া। তিনি বিকারগ্রস্ত এক উন্মাদ।

তার পরিণতি হবে খুবই শোচনীয়। যখন তিনি মুখ ব্যাদান করে দাড়াঁলেন আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম এবং রাস্তায় প্রথম রিকশাটায় চাপলাম। হোটেলে গিয়ে বিল পরিশোধ করলাম। সুটকেসটা হাতে নিয়ে যখন বেরুতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম মুক্তিবাহিনী নীচে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। তারা একথা বলতে বলতে আমার কাছে এলো যে আমি দেশের পিতাকে অপমান করেছি এবং সে জন্য আমাকে চরম মূল্য দিতে হবে। তাদের এই গোলযোগের মধ্যেপাঁচজন অষ্টেলিয়ানের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হলাম। তারা এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে প্রবেশ করছিল। এয়ারপোর্ট দু'জন ভারতীয় কর্মকর্তা আমাকে বিমানে উঠিয়ে নিলেন এবং নিরাপদ হলাম। (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)।-অনুবাদ ঃ আনোয়ার হোসেন বাঙ্গাল

প্রশ্ন ঃ এমন কিছু এলাকার নাম বলবেন কি একাত্তরের, যুদ্ধে যেখান থেকে মোটেই লোক মরেনি। কিংবা অল্প লোক মরেছে?

উত্তর ঃ এর জবাব আমার চাইতে আপনারাই ভাল জানেন। আপনিই বলুন আপনার গ্রামে ও আপনার পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে ক'জন লোক মারা গেছে? তবুও শুনুন কিছু গ্রামের নাম বলছি। আমাদের গ্রাম পাটখালি এবং

islamirenesaandolon.blogspot.com

পার্শ্ববর্তী গ্রাম শিমুলিয়া- যে গ্রামে সব ক'টি লোকই হিন্দু- সে গ্রাম থেকে একটি লোকও মারা যায়নি। তাছাড়া গাঙনী, নতুন গ্রাম, বলুগ্রাম, পলিতা, বিজয়খালী, কুল্লিয়া, কুচিয়ামোড়া, সত্যবানপুর, চাঁনপুর এ সব গ্রাম থেকে কেউ মরেনি। তবে ভাঙ্গুড়া ও বেরইল গ্রাম থেকে ৪/৫জন লোক মরেছে। তাছাড়া শালিখা থানার গঙ্গারামপুর, মধুখালী পুলুম এলাকা থেকেও বহু লোক মরেছে যাদের সাথে মুক্তিফৌজ বা রাজকারের কোন সম্পর্ক ছিলনা, মেরেছে নক্সাল পন্থীরা। আর আমাদের ইউনিয়নের আমুড়িয়া গ্রাম থেকে মরেছে ১৭/১৮ জন লোক তাছাড়া তার পার্শ্ববর্তী চাপড়া, বাটিকা বাটি, শলই কলইডাঙ্গা ইত্যাদি বহু গ্রাম থেকে কেউ মরেনি।

শুনেছি বগুড়া জেলার ক্ষেতলাল উপজেলার কয়েক জন হিন্দু পাঞ্জাবীদের দেখে ভয়ে গাছে উঠেছিল। তাদের প্রায় ৫/৭ জনকে পাঞ্জাবীরা গুলি করে মেরেছিল যেন গাছের পাখী মারা হল। আর পাঞ্জবীদের দেখে ১২/১৩ জন যুবক ভয়ে আখ খেতের মধ্যে পালিয়ে ছিল তাদেরকে ধরে নিয়ে গেলে জনাব আব্বাস আলী খান দৌড়ে যান তাদের উদ্ধার করতে।

গিয়ে শুনেন মেরে ফেলা হয়েছে। তিনি সেখানে যাদের দেখেছিলেন তারা এখন ভাল মানুষ। এই ২০/২১ জন ঐ থানা থেকে মারা গেছে।

শুনেছি কাপাশিয়া থানা থেকে পাঞ্জাবীরা ১জন কৃষককে মেরেছে আর মুক্তিফৌজরা নিজেরা ভাগাভাগি নিয়ে গন্ডগোল করে মরেছে কয়েকজন আর মনোহরদি থেকে জয় বাংলা না বলার কারণে ৫/৭ জনকে মারা হয়েছে।

নওগাঁর মহাদেবপুর থানায় গিয়ে শুনলাম ঐ এলাকায় প্রায় ৩০/৪০টা গ্রাম থেকে কেউ মারা যায়নি। তবে মান্দা উপজেলার এক গ্রাম থেকে একশতের বেশি লোক পাঞ্জাবীরা মেরে ফেলে। আর শান্তাহার থেকে কয়েকজনকে জামায়াত সমর্থন করার কারণে মুক্তিফৌজরা ধরে এনে তাদের মা-বাবার সামনে গায়ের চামড়া ছিলে তুলেছে যেন গুরুর চামড়া ছিলা হয়। আর এত নৃশংসভাবে কয়েকটা পরিবারকে হত্যা করা হয়েছে যা শুনলে গা শিহরে ওঠে। শান্তাহার বিহারী পল্লী ঘেরাও করে ৬/৭ হাজার বিহারী মারা হয়েছে।

ভোলার দক্ষিণ অঞ্চলে ১৬ ই ডিসেম্বরের পূর্বে দু'চার জন লোক মরেছে। পরে যা মরেছে জয় বাংলা না বলার কারণে কিংবা ক্ষমতা লাভের দ্বন্দ্বের কারণে মরেছে। মানিকগঞ্জের শিঙ্গাইর থানার উরঙ্গবাদ গ্রাম থেকে একজন উকিল সাহেব মুসলীম লীগের ছিলেন বলে তাকে মেরে ফেলা হয়েছিল। তাছাড়া গাড়াদিয়া, বায়রা, চর জামালপুর এলাকা থেকে শুরু করে

islamirenesaandolon.blogspot.com

পূর্বে জয়মইপ, দক্ষিণে প্রায় ১০/১২ মাইলের মধ্যে কোন লোক মারা যায়নি। তবে নদীর ধারের কয়েকটা গ্রাম থেকে ৭/৮ জনকে পাক সেনারা মেরেছিল বলে শুনেছি। এছাড়া আরও বহু এলাকার খবর রাখি যে সব জায়গা থেকে মাঝে মধ্যে ২/৪ জন ছাড়া ঝাঁকে ঝাঁকে লোক মরেনি। তবে পাক সেনারা যে সব জায়গায় ঘাঠি করেছে তার আশপাশের কিছু লোক মরেছে কোন জায়গায় তারা বহু লোক এক সঙ্গে দাঁড় করিয়ে দিয়ে কলেমা তৈয়াবা পড়তে বলেছে। যারা পড়তে পেরেছে তাদের কিছু বলেনি। যারা পড়তে পারেনি তাদের মেরে ফেলেছে। এই ছিল বাস্তব চিত্র আসলে হিন্দু ও রুশভারত পন্থীরাই ছিল পাঞ্জাবীদের টার্গেট। কালেমা জানা মুসলমানদের তারা মারতে চায়নি।

এই জন্যে ঐ সময় হিন্দুরা লুঙ্গি পড়ত এবং কালেমা মুখস্ত করে নিয়েছিল। এবং অনেকেই মুসলমান হয়েছিল যশোরে এমন কিছু হিন্দু এখনও মুসলমান আছে। আর রাজাকাররা সাধারণত রাইফেল হাতে পেয়ে স্থানীয়ভাবে যাদের সঙ্গে পূর্ব শত্রুতা ও দলাদলি ছিল তাদের মেরে মনের রাগ ঝেড়েছে। সারা দেশ মুক্ত করার জন্যে মারা নয়। দেশের আর যে সব এলাকার লোক মারার খবর দিয়েছি তা নিম্নে দেয়া হল। এ দ্বারা কাছাকাছি অনুমান করা যাবে যে কি পরিমাণ লোক মরতে পারে ৭১-এর যুদ্ধে এটা ১০০% সঠিক তা আমার দাবি নয় তবে সঠিকের সর্বাধিক কাছাকাছি বলে আমি বিশ্বাস রাখি।

আমাদের মাগুরা জেলার শালিখা থানাটা হচ্ছে হিন্দু প্রধান এলাকা। ঐ এলাকার কয়েকটি গ্রাম এমন আছে যেখানে একটিও মুসলমান নেই। এই পুরা থানা থেকে বড় জোর ২০/২২ জন লোক মারা গিয়েছে বলে শুনেছি (তবে নকশালদের মারা এর বাইরে) বরইচারা, নরপতি, বাউলিয়া,এসব এলাকার একটিও মুসলমান নেই। কিন্তু সেখানে থেকে একটিও লোক মারা যায়নি। পার্শ্ববর্তী ২০/২৫ গ্রাম থেকেও কেউ মরেনি তবে রাজাপুর ইউনিয়নের বনগ্রাম গ্রামের আঃ বারী সাহেব যিনি ছিলেন ঐ এলাকার একজন প্রভাবশালী মুসলমান তাকে এবং তার ছেলেকে রাজাপুরের হিন্দুরা মেরে ফেলেছে।

মুক্তিফৌজরা ধোয়াইল গ্রমেও নবীন নামের এক নকশালপন্থীকে নিত্যানন্দপুর গ্রাম থেকে ধরে এনে আধা মরা করে বস্তায় পুরে বস্তার মুখ বেঁধে পানিতে ফেলে দেয়। আর জামায়াত সমর্থক ঐ গ্রামের এক জামাইকে শশুর বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে মুক্তিফৌজরা মেরে ফেলে। এছাড়া পুরা

islamirenesaandolon.blogspot.com

মোহাম্মাদপুর থানা থেকে ধরে নিয়ে ৮টি ইউনিয়ন থেকে ২৪/২৫ জন লোক মরার কথা শুনেছি। (তবে নকশালদের মারা এর বাইরে) ঐ সময় যশোর জেলার যে লোক মরেছে তার অর্ধেকেরও বেশি মরেছে নকশালদের হাতে তারা বহু চেয়্যারম্যান মেরে ফেলেছে। যার সাথে মুক্তিযুদ্ধের কোন সর্ম্পক ছিল না।

ময়মনসিংহ জেলার মুক্তাগাছা এলাকার এক নওমুসলিম যুবকের নিকট শুনেছি মুক্তাগাছা থানার মনিকুনা গ্রাম থেকে দুই পরিবার জেদের বসবর্তী হয়ে মারামারি করে দুই পরিবারের সবকটা লোক মারা যায়। তাদের এক পরিবার ছিল আওয়ামীলীগ সর্মথক অপরটা ছিল মুসলিম লীগ সমর্থক। তাছাড়া ঐ এলাকার বড়গ্রাম , কুরীপাড়া, পদুরবাড়ী ইত্যাদি গ্রাম থেকে কেউ মরেনি।

ভোলার চরনোয়াবাদ গ্রামে এক ভদ্রলোক থেকে শুনলাম তার গ্রাম এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাপতা, চর পেটিকা, জমিরালাত গ্রাম থেকে কেউ মারা যায়নি। তবে সদুররে গ্রাম থেকে দুজন ডাকাতকে পাঞ্জাবীরা মেরে ফেলে। ভোলার মাওঃ হাকিম আঃ মান্নান সাহেবকে জয় বাংলা না বলার অপরাধে মুক্তিফৌজরা মেরে ফেলে। চরফ্যাশন এলাকার ৮টি ইউনিয়ন থেকে কোন লোক মারা যায়নি। তবে বর্ণনাকারীর মতে ভোলা জেলা থেকে বড় জোর ১০০ জনের মত লোক মারা গিয়েছে তার ৬০/৬৫ জনই মরেছে মুক্তিফৌজদের হাতে। বাকি গুলো মরেছে পাঞ্জাবী ও রাজাকারদের হাতে।

উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে

শেখ সাহেব দেশে ফিরে আসার পর ঠিক যে কায়দায় শেখ সাহেবের লোকেরা লোক হত্যা করেছিল অর্থাৎ পিতা-মাতার সামনে সন্তানকে, সন্তানদের সামনে তার পিতাকে, স্ত্রীর সামনে তার স্বামীকে। যেমন কুদ্দুস মোল্লা ডাকাত (মুক্তিফৌজ) ছিল। মুলাদি থানার মাওঃ আঃ মজিদ সাহেবকে এই ধরণের আরো কিছু খবর পাবেন এই বইয়েরই মধ্যে পরে শেখ সাহেবের কাছে মুক্তিফৌজরা বলল; স্যার পাঞ্জাবীরা আর তাদের দালালরা পিতার সামনে ছেলেকে, ছেলে-মেয়েদের সামনে তার পিতাকে ওরা জবাই করেছে। অথচ এসব ওরাই করেছিল যার সাক্ষী দেশের লোকই।

কিন্তু পরে মুক্তিফৌজরা তাদের সব দোষ চাপাল তাদের পতিপক্ষের ঘাড়ে। আর প্রতিপক্ষের তখন মুখে তালা লাগান ছিল। প্রতিবাদ করার বা কিছু বলার কোন ক্ষমতা ছিল না করোরই। কাজেই শেখ সাহেব ওদের কথাই বিশ্বাস করে নিয়েছিলেন। এরই নাম উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে"।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমি একথা জানা সত্তেও এর প্রথম সংস্করণে বলিনি। বলেছি ওরিয়ানা ফালাচির সাক্ষাতকার বেরোনার পরে। এভাবে আরো কিছু কথা আমার নিকট জমা রইল যা ইনশাআল্লাহ্ পরবর্তী সংস্করণ এ পাবেন।

মুক্তিফৌজের হাতে যারা মরেছে

১। মুজিবুল হক মিয়া- শিবগ্রাম, আমিনাবাদ ইউনিয়ন, চরফ্যাশন।

২। চৌধুরী মিয়া- গ্রাম চরশিবা, আমিনাবাদ, চরফ্যাশন।

এরা খুবই প্রভাবশালী মুসলিম লীগের ছিলেন। এদেরকে ভোলা থানার কাচিয়া ইউনিয়নের বরাইপুরস্থ নদীর পাড়ে নিয়ে হত্যা করা হয়।

৩। মোহাম্মদ টনি সাহেব চেয়ারম্যান, দক্ষিণ দিঘলদি ইউনিয়ন। মুসলিম লীগের জেলা পর্যায়ের নেতা। তাকে উপর্যপুরি কয়েকদিন যাবত নির্যাতন করে হত্যা করে।

৪। ধনিয়ার মেম্বার নেজামুল হক ও তার ভাই। সাং গঙ্গাকির্তী, ধনিয়া ইউনিয়ন।

৫। হাকিম আঃ মান্নান- ভোলা শহর। নেজামে ইসলামী পাটির ভোলা জেলার দায়িত্বশীল।

৬। S.D.O সাহেবের একজন খুবই দক্ষ ড্রাইভার।

৭। ভোলা মহাকুমা আনসার এডজুটেন্ট। তাকে কাবিল মসজিদের কাছে নির্যাতন করে হত্যা করে।

৮। মৌলভী ফজলে আলী - চরপাতা ইউনিয়ন, দৌলতখান।

৯। মাওলানা মোঃ ফয়েজ এম, এ, স্কলার। পিতা মৌলভী ফজলে আলী, সাং চরপাতা, দৌলতখান। তিনি পিতা মৌঃ ফজলে আলীসহ তারাবীহ নামায শেষে বের হলেই অসহায় মুসল্লীদের সামনে উভয়কে পাশাপাশি জবাই করে হত্যা করে। জনাব ফজলে ছিলেন ভোলার পীর সুফি হাবিবুর রহমান সাহেবের জামাতা।

১০। মাওলানা আবুল ফাতাহ, পিতা,মওলানা আবুল বাশার, প্রিন্সিপাল, হাজিপুর ফাজিল মাদ্রাসা, হাজিপুর, দৌলতখান। চরমোনাই পীর সাহেবের শ্যালক। তাকে বাবা-মা ও ভাই-বোনদের হাতে থেকে ছিনিয়ে নিয়ে হত্যা করে।

১১। মাওলানা আবু সাঈদ, সাং জয়নগর। ঘরের মধ্যে ধরে মা-বাবার সামনে জবাই করে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

১২। কবি আবদুল খালেক, ভোলা, সাং বাট্টামারা।

১৩। কাচিয়া ইউনিয়নের বরাইপুর গ্রামের হাওলাদার বাড়ীর মোঃ মোস্তফা নামের নেতৃস্থানীয় এক যুবককে।

১৪। মাস্টার মুতাহার সাহেব এম,এ। গজারিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, আওয়ামীলীগের এম, পি এবং বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা। তাকে মারে রক্ষী বাহিনী।

১৫। ভোলা শহরের রতন চৌধুরী শ্রমিক নেতা, পৌরসভা চেয়ারম্যান, প্রতিদ্বন্দ্বী তাকে চাদমহল সিনেমা হলের সম্মুখে প্রকাশ্যে গুলি করে হত্যা করে।

১৬। মোঃ সালেহ আহমেদ। ভোলা কলেজের প্রাক্তন ভি, পি ও ছাত্রলীগের নেতা। আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্মী, মারা যায় মুক্তি বাহিনীর হাতে।

১৭। মোঃ সাইফুল্লাহ ছাত্রলীগ নেতা, পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ নেতা এবং তিনি ছিলেন মুজিব বাহিনীর স্থানীয় নেতা।

১৮। জিল্লুর রহমান জুলু। ছাত্রলীগের কর্মী, মারা যায় ভিন্ন গ্রুপের হাতে।

১৯। মোঃ লোকমান। তালাবায়ে আরাবিয়ার কর্মী, পিতা মোঃ রহিম বকস। সাং ইলিশা, ইলিশা ইউনিয়ন।

২০। সুফি হাবিবুর রহমানের উচ্চ শিক্ষিত দুই ছেলেকে ভোলা শহরের অদুরে মুক্তিবাহিনীর অপর গ্রুপ হত্যা করে।

পাঞ্জাবীদের হাতে যারা মরেছে

১। চরফ্যাশনের মোহাম্মদ উল্লাহ। ঠিকাদার , সাং নীলকমল, নুরাবাদ।

২। আবু তাহের। ইলিশা ইউনিয়ন, সাং ইলিশা, ভোলা।

৩। টনির হাটের কাছে যুদ্ধে আনুমানিক ২০/২৫ জন লোক মারা যায়। এতে পাক সেনাও মারা যায় ৫/৬ জন।

৪। পাকসেনাদের হাতে ভোলা শহরে নির্যাতিতা হয় ১৫/১৬ বছরের একটি মেয়ে। এটা গুজবের মত শোনা গেছে।

৫। রাজাকারদের মধ্যে কোরবান আলী ব্যাপারীর দুই ছেলে ছিল উল্লেখযোগ্য রাজাকার। এদের বাবা ছিলেন মুসলিমলীগের কিন্তু এরা ছিল আওয়ামীলীগ সমর্থক। শোনা যায় এরা মারা গিয়েছে পাঞ্জাবীদের হাতে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর কয়েক দিনের মধ্যে এক দল মুক্তিবাহিনী ট্রেজারী লুট করতে আসে। তখন ভোলার সাধারণ নাগরিকদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধে। এতে একজন নিরীহ পথচারী মারা যায় এবং ৩ জন মুক্তিবাহিনী মারা যায়। পাঞ্জাবীরা যখন এ এলাকায় প্রবেশ করে তখন তারা পশ্চিমে ভোলার খেয়াঘাটকে এবং পূর্বদিকে মেঘনার তীরে শান্তির হাটের রাস্তার মাথাটাকে বধ্য ভূমিতে পরিণত করে।

তারা বিভিন্ন সময় নানা অভিযোগে কিছু লোককে সেখানে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। স্থানীয় লোকদের বর্ণনা মুতাবিক দুই স্থানে প্রায় ১৫/২০ জন লোককে তারা গুলি অথবা বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করে। এদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্য বেশী ছিল। পাক সেনাদের ক্যাম্প ছিল ওয়াপদা অফিস চত্বরে। শোনা যায়, এরা অন্য স্থান থেকে কিছু লোক ধরে এনে এখানে মারে এবং তাদের এই এলাকার মধ্যে গণকবর দেয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এটা আবিষ্কার হয় বলে গুজব রটে। এছাড়া মুক্তিবাহিনী গাজীপুরের দিকে মেঘনা নদীর তীর থেকে পাক নৌ বাহিনীর দু'টি গান বোটে হামলা করলে কিছুক্ষণের মধ্যে পি,এ,এফ এর দুটি জঙ্গি বিমান সেখানে গিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে তাতে সেখানের ১জন মহিলাসহ মোট দুই জন লোক মারা যায় এবং কিছু ঘর বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

এই সময় ভোলা চরফ্যাশন রোডে ডাইরীর নিকট ২ জন বাজারগামী গরীব হিন্দুকে পাঞ্জাবীরা গুলি করে মারে। এছাড়া ছিটেফোটা আরও দু'চার জন মারা হয় বলে শোনা যায়।

দৌলতখান থানার উপর একবার মুক্তিবাহিনী চড়াও হয়। তাতে রাজাকার ও মুক্তিবাহিনীতে তুমুল সংঘর্ষ হয়। এতে সম্ভবতঃ ১জন মুক্তিফৌজ নিহত হয় এবং ৫/৬ জন রাজাকারকে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। সেখানে ২জন সরকারী অফিসারকে মুক্তিফৌজরা হত্যা করে।

বলেছেন মুনসী আঃ রব, যার ঠিকানা গ্রাম- মোহাম্মদ পুর, ডাক কল্যাপদি, উপজেলা-সেনবাগ, জিলা নোয়াখালী- বর্তমান উপজেলা দাগন ভূঁইয়া।

উপরোক্ত ব্যক্তির বর্ণনা অনুযায়ী আঃ হক, পিতা মুছলিম উদ্দিন এক ব্যক্তির পথ চলার সময় পাঞ্জাবীদের গুলিতে মারা যায়। এবং রমযান আলী, পিতা লাল মিয়া নামক একজন রাজাকারকে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর গ্রাম্য লোকেরা মেরে ফেলে। এছাড়া আহমদ পুর, চাদপুর, শাহপুর বিজবাগ,

islamirenesaandolon.blogspot.com

রাজারামপুর ও রামনগর ইত্যাদি গ্রাম থেকে বর্ণনাকারীর মতে অন্য কোন লোক মারা যায়নি।

মুহাম্মদ শামসুল আলম গ্রাম-ধাওয়া, ডাক-পূর্ব ধাওয়া উপজেলা-ভান্ডারিয়া, জিলা-পিরোজপুর। তিনি বলেছেন লোক মুখে শুনেছি যে, পার্শ্ববর্তী গ্রাম রাজপাশা, নদমূলা, শিয়ালকাঠি, কানুয়া, বানাই ইত্যাদি গ্রাম থেকে ৪/৫ জন লোক মারা গিয়েছে। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে কারও মৃত্যুর সংবাদ আমার জানা নেই।

জনাব মাওলানা সৈয়দ মুজিবুর রহমান, পিতা-মরহুম মাওঃ সৈয়দ আঃ হামিদ, গ্রাম- গোরাইল, পো- মির্জাপুর, থানা- মির্জাপুর, টাঙ্গাইল। এই বর্ণনাকারীর মতে গোরাইল গ্রামের একটা আধ পাগলা লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে পাঞ্জাবীরা গুলি করে মারে। এছাড়া পার্শ্ববর্তী কোন লোক মরেনি। নোমান নামের এক ভদ্রলোক যার সাকিন খড়কি, উপজেলা মাধবপুর, জেলা হবিগঞ্জ। তার নিকট শুনেছি- তার গ্রাম থেকে কেউ মরেনি। এবং পার্শ্ববর্তী খাটুয়া, বেজুড়া বুল্লা, উজ্জলপুর (পুরাটাই হিন্দু বসতি) চাপড়তলা, ইটাখোলা ইত্যাদি গ্রাম থেকে কেউ মরেনি।

তবে পিয়াইমের বিশিষ্ট সমাজ কর্মী একজন মুসলিম লীগার জনাব ফারুক মিয়াকে মুক্তিযোদ্ধারা মেরে ফেলেছিল। আর মুড়িআউক গ্রামের একজন আলেমকে মেরে ফেলে। তিনি ছিলেন খড়কীর মাওঃ শরীফুদ্দিন সাহেবের জামাতা। তার দোষ, তিনি আলেম ছিলেন কিন্তু কোন রাজনৈতিক দল করতেন না।

আর শুনেছি জনাব কায়সার সাহেবের পিতা জনাব এ্যাডভোকেট সায়ীদ উদ্দীন সাহেবকে মুসলীমলীগ করার কারণে মুক্তিফৌজরা মেরে মেরে যখন মনে করেছে যে মরে গেছে তখন তারা চলে যায় পরে তিনি বেঁচে উঠেন। শুনেছি তার এক মিলের যন্ত্রপাতি মিত্র বাহিনীর লোকেরা খুলে নিয়ে যায়।

শুনেছি নারায়নপুর (মাধবপুর) গ্রামের প্রায় ৫০% লোক ছিল রাজাকার। অথচ ঐ গ্রামে পূর্বে কোন লোক জামাতের ছিলনা। আজও নেই, শুনেছি ব্রাহ্মণ বাড়ীয়ার মহেশপুর মোকন্দপুর, সিঙ্গারবিল, আদমপুর, শ্রীপুর ইত্যাদি এলাকা থেকে কেউ মারা যায়নি। শুনেছি মনোহরদী উপজেলার লেবুতলা, খিদিরপুব, চরমান্দলিয়া, কচিকাটা, চালাকচর, ইত্যাদি ইউনিয়ন থেতে ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে কেউ মরেনি। পরে মরেছে তামুককান্দা ইউ, পি চেয়্যারম্যান আসমত আলী, নোয়াকান্দির হাজি আজমুদ্দিন যাকে জয় বাংলা না বলার

islamirenesaandolon.blogspot.com

কারণে মেরে ফেলে। আর শুনেছি মোজাফফর ন্যাপের মাস্টার আঃ রশীদ সাহেবকে (সম্ভবত ঃ তিনি খিদির পুর হাই স্কুলের একজন শিক্ষক ছিলেন) তার বন্ধু- বান্ধবরা নাকি কোথায় দাওয়াত করে নিয়ে গিয়ে সেখানে মেরে ফেলে।

শুনেছি খুলনার রামপাল উপজেলার মল্লিকের বেড় ইউনিয়ন থেকে একটা গরু চোরকে রাজাকার ছিল বলে মেরে ফেলে আর ঐ একই উপজেলা থেকে হাসান নামে এক হাফেজ সাহেবকে মুক্তি বাহিনীর লোকেরা মেরে ফেলে। তা ছাড়া গোটা উপজেলা থেকে খুব উর্ধে হলেও ১০/১২ জন লোক মরেছে, অথচ গোটা উপজেলার প্রায় অর্ধেকই হিন্দু অধিবাসী।

আর শুনেছি দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বাগেরহাটের শরণখোলা উপজেলা আমতলী পীর সাহেবের ছেলে মুক্তিফৌজরা ধরে নিয়ে মেরে ফেলে আর ১৭ জনকে মুক্তিফৌজরা এক সঙ্গে গুলি করে মারে। আর শুনেছি মোড়লগঞ্জের ৫ জনকে গুলি করে মারে ৮ জনকে জবাই করে মারে। এদেরকেও মুক্তিফৌজরা মারে বলে শুনেছি। এ ৫+৮ = ১৩ জনই ছিল জামায়াত পন্থী।

আর শুনেছি পাঞ্জাবীরা ১ টা নিরাপরাধ ছেলেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে। শুনেছি নেত্রকোনার কেন্দুয়া উপজেলার ১০টা ইউনিয়ন থেকে বড় জোর ২০/২২জন লোক মারা যায় তার ১০/১২ জনকে মারে মিলিটারীরা তাদেরকে দিয়েছিল গুলির বাক্স বইতে। তাদের আঠারবাড়ী রেল স্টেশন থেকে কেন্দুয়া পর্যন্ত গুলির বাক্স বয়ে নেয়ার জন্য ধরে আনে। যারা ভারী বাক্স বইতে অপারগ হয়েছিল তাদের ১০/১২ জনকে ওরা গুলি করে মারে। আর শুনেছি রায়ের বাজার (আঠারবাড়ী রেল স্টেশনের পার্শ্বে একটা বড় বাজার) এক পার্শ্বে যেখানে আওয়ামি লীগের অফিস ছিল। সেখানে পাঞ্জাবীরা আগুন ধরিয়ে দিলে বাজারে কিছু অংশ পুড়ে যায় এছাড়া ঐ উপজেলায় আর কোন মরার খবর ঐ এলাকার লোক বলেনি। ঐ এলাকার নিহতের মধ্যে রয়েছে সমকান্দার আঃ গফুর ভূইয়া, মুঃ লীগার। তাকে মারে তার আপন ভাইয়ের সহযোগিতায় মুক্তিফৌজের লোকেরা পরে তার সে ভাই কিছুদিন পূর্বে শুনেছি কলেরা হয়ে মারা যায় এবং এক নর্দমার মধ্যে নর্দমার পঁচা পানি খেয়ে মরে। এই লোক সম্পর্কে স্থানীয় লোক বলে সে নাকি নিজের মেয়েকেও মেরে ফেলেছিল। লোকটির নাম ছিল আঃ মান্নান ভুঁইয়া।

আর শুনেছি বারইকান্দার আঃ লতীফ মাস্টারকে (মুঃ লীগার) পাক বাহিনীর লোকেরা মেরে ফেলে। আর মারে গরাডোবা ইউনিয়নের পাটারিয়া

islamirenesaandolon.blogspot.com

গ্রাম থেকে নুরুল ইসলাম নামের ১টি লোককে। এসব মিলে কেন্দুয়া উপজেলা থেকে বর্ণনাকারীর মতে উর্ধে ২০/২২ জন লোক মরেছে।

বর্ণানাকারী জনাব মোবারক হোসেন, গান্ডা ইউনিয়ন, তার গ্রামের নামটা এখন মনে পড়ছেনা। বর্ণনাকারীর মতে আরো ২জনের নাম মনে পড়ছে তারা হল তারা মিয়া রাজাকার আর হাফেজুদ্দিন কশাই। সেও এক রাজাকার ছিল। আর শুনেছি কিশোরগঞ্জের সর্বজন শ্রদ্ধেয় হযরত মাওঃ আতাহার আলী সাহেবকে মুক্তিফৌজরা মেরে জেল হাজতে দেয়। অনেকের মতে সেই মার খেয়ে তিনি যে অসুস্থ হয়ে পড়েন তাতেই তিনি পরে মারা যান।

আর শুনেছি নান্দাইলের মাওঃ মহিউদ্দিন সাহেব তিনি সম্ভবতঃ জামেয়া ইমদানিয়ার ছাত্র ছিলেন তাকে মুক্তিফৌজরা মেরে ফেলে।

শুনেছি যশোরের বাঘারপাড়া উপজেলার নকশালরা কিছু লোক মেরেছে যাদের সাথে স্বাধীনতা যুদ্ধের কোন সম্পর্ক ছিল না। যেমন শুনেছি বাবরা গ্রামের ইন্তাজ শরফুদ্দিন, শফি উদ্দিন চেয়্যারম্যান, অহেদ আলী, ও বারিক মোল্লা এরা নকসালদের দ্বারা নিহত হয়। শুনেছি ভিটা বল্লা গ্রামের আয়েনুদ্দিনকে নকশালরা মারে, আর তেঘরী গ্রামের জনাব আলীকে রাজাকাররা মারে। আর বাকভাঙ্গার ইউপি আতিয়ার চেয়াম্যানকে নকশালরা মারে।

শুনেছি সাইট খালির বর্তমান.. সোহরাব মোল্লার দুই ভাইকে নকসালরা মেরে ফেলে। শুনেছি ধলগ্রামের ৩জন ও শ্রীরামপুরের রুস্তম আলীকে মারে রাজাকাররা আর দলগ্রামের ২জনকে মারে মুক্তি ফৌজরা। এভাবে যা হিসাব এলাকার লোক আমার নিকট বলেছে তাতে ঐ এলাকায় গড়ে যতগুলো গ্রাম আছে ঠিক ততগুলো লোক মরেছে বলে মনে হয়না। তবে নকশালদের হাতে বাঘারপাড়া ও শালিখার মোট প্রায় দেড়শতের কাছাকাছি হবে লোক মরেছে যাদের সাথে মুক্তি যুদ্ধের দুরতম কোন সম্পর্ক ছিল না।

বৃহত্তর রংপুর জেলার উলিপুরের এক ইঞ্জিনিয়ার বলেছেন, তাদের এলাকার প্রায় ৫০ জন রাজাকারের একটিও কোন ইসলামী দলের সমর্থক ছিলনা। বরং তারা ছিল এলাকার সব চাইতে বড় নাম করা দুস্কৃতিকারী। ঐ এলাকা এবং রংপুরের আরো কিছু এলাকার খবর নিয়ে যা যতটুকু জানতে পেরেছি তাতে ঐ সব এলাকার খুবই কম লোক মারা পড়েছে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

দিনাজপুরের জনাব আবুল কাসেম এ্যাডভোকেট সাহেবের নিকট থেকে সংগ্রহ করা কিছু খবর নিম্নে দেয়া হল, যা তার নিজের হাতের লেখা তথ্য। এবং সে লেখাটা আমার ফাইলে সংরক্ষিত রয়েছে।

তিনি লিখেছেন আমার জানা মতে দিনাজপুর শহরে কোথাও কোন ঘর বাড়ীতে আগুন লাগান হয়নি। একটি ঘরও কারো পোড়েনি। এছাড়া তিনি শান্তি কমিটির সদস্য হওয়ার পর যাদেরকে পাঞ্জাবীদের হাত থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে রয়েছে দিনাজপুর শহরের বিশিষ্ট জোতদার ও নবীন হোটেলের মালিক জনাব আবু বক্কর চৌধুরী। বিশিষ্ট ছাপা খানা ব্যবসায়ী জনাব আসলে উদ্দিন আহমেদ। সরকারী কর্মচারী হাজী মোঃ দেওয়ান, কালিতলা নিবাসি। এদের সবাই শান্তি কমিটির সভাপতির হস্তক্ষেপে জীবন রক্ষা পেয়েছে। এ ছাড়া ছাত্র ব্যবসায়ী আইনজীবি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ, বিশিষ্ট জোতদারগণ। বিভিন্ন সময় যুদ্ধের ৯মাসে যারাই শহরে এসেছেন এবং খান সেনাদের হাতে ধরা পড়েছেন তাদের প্রত্যেককে তখনকার জামায়াত নেতা জনাব আবুল কাসেম এ্যাডভোকেট সাহেব খান সেনাদের হাত থেকে উদ্ধার করে দিয়েছেন।

এছাড়াও তিনি লিখেছেন যুদ্ধের ৯মাসে শহরের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জীবন দিতে হয়নি। এছাড়া ব্যক্তি আক্রোশে অনুল্লেখ যোগ্য বাইরের ২/১জন ছাড়া কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিই মারা যায়নি। সে বস গুলির কিছু গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করছি অবশ্য সব গ্রামের না। এ সংস্করণে লিখলাম শুধু নাম এই জন্য যে কলেবর বৃদ্ধি করতে চাচ্ছিনা। চাচ্ছি শুধু একটা গড় হিসাব যেন দেশবাসী পেতে পারে। সে জন্যেই তার দেয়া কিছু গ্রামের নাম নিম্নে দিচ্ছি। (হাতের লেখা উদ্ধার করতে না পারায় ২/১টা গ্রামের নামে কিছুটা বানানের ভূল ত্রুটি থাকতে পারে।) শশরা, উথরাইল, উসর, পাইল শংকরপুর, কদমপুর, বনপাড়া, শালকী, মনিপুর, বড়গ্রাম, আটোর, ছাইতানকুড়ি, খানপুর, বনপাড়া, ছাইনুড়, জালালপুর, তাজপুর, গৌরীপুর, মুরারিপুর, বুনিয়াজপুর, মুনসীপাড়া, নড়াবাড়ী, দারেলি রাজনাহার, কাশিডাঙ্গা, আলুবাড়ী, ভাবাটি গোবিন্দপুর, মদনপুর অন্য আরেক থানার ইসমাইল, ছোট গোবিন্দুপুর, রসুলপুর, কামোর কোটগাও তকান্দু, রামপুর, ঈশ্বর গ্রাম, খানপুরহাট, দাতৈল, মুকুন্দপুর দহন্ডা, বীরগঞ্জ, নওপাড়া, কবিরাজ হাট, কল্যানি, লাটের হাট, ঝড়বাড়ী গোলাপগঞ্জ, শীতলাই, বড়শীতলাই, বটতলী, সাহানপুর, গোবিন্দপুর, খানশামা, বাকেরহাট, ভেরভেরী টংগুয়া, তেরাভিয়া, ভুলারহাট, ইত্যাদি আরো অনেক গুলো গ্রাম।

islamirenesaandolon.blogspot.com

পাবনা জেলার মোঃ নুরুল হক মিয়া থেকে সংগ্রহ করা তথ্য তিনি মাড়মি সুলতানপুর সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। তিনি বলেন খান সেনারা ১১ই এপ্রিল পাবনা থেকে ঈশ্বরদী যাওয়ার পথে স্থানীয় কিছু আঃলীগ কর্মীরা দাশুড়িয়ায় রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে তারা অন্যত্র দুরে সরে যায়। ঐ সময় খান সেনাদের যারা সামনে পড়ে তাদের ৪ জনকে ওরা গুলি করে হত্যা করে। এ ৪জন হচ্ছে আঃ রহমান, দক্ষিনা রঞ্জন, আইনুল হক ও প্রমথ নাথ সরকার। এছাড়া তিনি বলেন আমার জানা মতে দাশুড়িয়া ইউনিয়নের মোট ২৬ টি গ্রাম থেকে ১৬ ই ডিসেম্বর পূর্বে কেউ মারা যায় নি তবে ১৬ ই ডিসেম্বরের পরে মুক্তিফৌজের হাতে কিছু লোক মারা যায়। তিনি বলেন এ এলাকা থেকে যা কিছু লোক মারা পড়েছে তার সাথে মুক্তিযুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। শুধু ব্যক্তি আক্রোশে রাইফেল হাতে পেয়ে প্রতিপক্ষকে মেরেছে। মেরেছে এমন সময় যখন যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে।

ব্রাহ্মন বাড়ীয়ার এক ভদ্রলোক যাকে আমি অত্যন্ত সৎ লোক বলে জানি, এবং জানি যে তিনি খোড়া ব্যক্তি, লাঠির সাহায্য ছাড়া চলা ফেরা করতে পারেন না, তার নাম কাজী সিরাজুল করিম। তিনি দেবগ্রাম পাইলট হাইস্কুলের শিক্ষক। তিনি বলেন তারঁ নানার বাড়ীতে ছিল ভারতীয় বাহিনীর ক্যাম্প। তিনি বলেন ইসলাম পন্থীদের উপর বিভিন্ন প্রকার নির্যাতন হতে দেখে তিনি ৪ঠা এপ্রিল বাড়ী ত্যাগ করে অন্যত্র নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেন, তিনি বলেন, তার জানা মতে ১০ই এপ্রিল এ এলাকায় পাঞ্জাবী প্রবেশ করে। পাঞ্জাবীদের খবর পেয়ে আমার নানার বাড়ীতে ভারতীয় বাহিনীর যে সব অস্ত্র ছিল তা পাহারা দেয়ার জন্যে তার নানার (মদন খান সাহেবের) বাড়ী তৎকালীন ছাত্র সংঘের ছাত্র মোঃ রিজাউল করিমকে রেখে যায়। অতঃপর পাক বাহিনীর লোকেরা উক্ত রেজউল করিমকে মুক্তি ফোজের লোক মনে করে তাকে গুলি করে মেরে ফেলে।

এরপর পাঞ্জাবীদের গতি বিধি পরীক্ষা করে দেখার জন্যে ইছাখানকে সেখানে পাঠায়। তাকে পাঞ্জাবীরা মেরে ফেলে অর্থাৎ মরল পাক পন্থী। ঐ এলাকার ৪ জন মুক্তি ফৌজ হিসাবে ভারতে চলে যায়। তারা হচ্ছেন কাজি আঃ রশিদ বর্ণনাকারীর ৩ মামা সাখাওয়াত খান, মোহসেন খান ও আমীর খান।

ঐ গ্রামের অথাৎ দেবগ্রাম যেটা ছিল তৎকালীন প্রাদেশিক জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেলের নিজ গ্রাম ঐ গ্রামের ১০/১২জন লোক মারা যায়।

islamirenesaandolon.blogspot.com

মজার ব্যাপার হলো এই যে, ভারতীয় বাহিনী জিজ্ঞাসা করে এখানে জামায়াত সেক্রেটারী জনাব আঃ খালেক সাহেবের বাড়ী কোনটি, তারা দেখিয়ে দেয়। (অবশ্য) আমি ঐ বাড়ীতে সশরীরে উপস্থিত হয়ে দেখে আসছি। বাড়ীটা ছিল ছোন খড়ের চাল ওয়ালা বাড়ী। যে সব বাড়ীতে সাধারণতঃ ৪র্থ শ্রেণীর লোকেরা বাস করে। ঐ বাড়ী দেখে ভারতীয় সৈন্যরা বিশ্বাস করতে পারেনি যে একটা রাজনৈতিক দলের সেক্রাটারী জেনারেলের বাড়ী এরূপ হতে পারে। তাই সে বাড়ীতে আগুন না লাগিয়ে তার পাশের একটা টিনের ঘরওয়ালা বাড়ীতে জনাব আঃ খালেক সাহেবের বাড়ী মনে করে পুড়িয়ে দেয়। এই ভাবে জনাব আঃ খালেক সাহেবের ছোনের ঘর রক্ষা পেয়ে যায়। তাছাড়া পার্শ্ববর্তী গ্রাম নোনাসার, টানোয়াপান্ডি, নোয়াপাড়া, নয়াদি, ভাবানিপুর, চরনা, কারণপুর, চন্দনসার, বরিসর, মুডডা, সাতপাড়া, কেন্দুয়া, আনন্দপুর, বিজয়পুর, কুসুমবাড়ী, খলিলপুর, লিলাঘাইত, দারইন, ষোলচর বর্ডারের, কাছে হওয়া সত্বেও এসব গ্রাম থেকে কোন লোক ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে মরেনি।

আখাউড়ার ৪ মাইল পশ্চিমে ব্রাহ্মনবাড়ীয়া যাওয়ার পথেই উজানিয়ার ব্রীজটা। দেবগ্রাম হাইস্কুলের ইসলামিয়াতের শিক্ষকের দুই ছেলে যথা ১। এ এম ইসহাক ও এ, এম ইয়াকুব ও আরো কয়েকজনেরে নির্দেশে এ ব্রীজটা ভেঙ্গে দেয়া হয়।

এছাড়া মর্মান্তিক ঘটনা হলো এই যে, ওখানে কিছু অবাঙ্গালী রেল কর্মচারী ছিল। তাদেরকে আঃলীগ প্রধান দিলুমিয়া ও নাজীর হোসেন ১৪ই এপ্রিলের পূর্বে প্রায় ২০০ শত অবাঙ্গালীদের বংশ সমেত মেরে ফেলে, তাদের যুবতী মেয়েরা বলছিল আপনারা আমাদের বিয়ে করে রেখে দেন কিন্তু মারবেন না। তাদের কোন কথা শোনা হয়নি। এবং তাদের একটা দুধের বাচ্চাকেও তারা ছাড়েনি। সব মেরে শেষ করেছে এবং আঃলীগ নেতৃদ্বয় আখাইড়ার সমস্ত গোডাউনগুলি, মালগাড়ীর সমস্ত মালপত্র লুট পাট করে নিয়ে যায় ট্রেনের বহু মালা মাল ভারতে পাচার হয়ে যায়।

ওখানে মোঃ আলী নামের একজন পাঞ্জাবী ছিল এবং তার কাছে মাত্র একটাই অস্ত্র ছিল। সে একা প্রায় আড়াই দিন পর্যন্ত পুরা ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে লড়ে এবং তাদের কে আটকে রাখে। এরপর ভারতীয় বাহিনীর জওয়ানরা ২ মাইল দক্ষিন দিয়ে পশ্চিম দিক থেকে ঘুরে গিয়ে তাকে।ঐ মোঃ আলী পাঞ্জাবীকে। গুলি করে মারে কিন্তু তাকে দিয়ে আত্মসমর্পণ করাতে

islamirenesaandolon.blogspot.com

পারেনি। ৭/৮ শত ভারতীয় বাহিনীকে একটি মাত্র লোক আড়াই দিন এভাবে আটকে রাখে। ভারতীয় বাহিনী ঐ এলাকায় প্রবেশের পথে জলদি রাস্তার পার্শ্বের কিছু লোককে ট্যাক থেকে গুলি করে মারে।

এখানকার আরো কিছু ঘটনা আমার নিকট জমা রইল, পরবর্তী সংস্করণে পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেয়ার নিয়ত রইল। বাকী আল্লাহর ইচ্ছা। একজন মুক্তিফৌজ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি যাওয়ার পর তার থেকে শোনা কথাগুলি এখানে লিখছি যদিও তার নাম নূরুল হোসেন, কিন্তু ছোটকালের ডাক নাম শানু মিয়া, পিতা- মরহুম আবুল কাশেম। প্রাক্তন চেয়ারম্যান, বিদ্যানন্দপুর ইউনিয়ন, উপজেলা মেহন্দিগঞ্জ, জেলা বরিশাল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার এলাকার কথা। তিনি সোজাসুজি বলে দিলেন তাদের এলাকায় পাঞ্জাবীরা কাউকে মারিনি তবে নদীপথে গানবোট নিয়ে তারা যখন চলত তখন মুক্তিফৌজরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়লে তারাও কিছু পাল্টা গুলি ছুড়তো, তবে তাতে কেউ হতাহত হয়েছে বলে আমি কারো মুখে শুনিনি।

তিনি বললেন, তাদের এলাকার এক ডাকাতকে ধরে এনে গ্রাম্য লোকেরা রায় দিলে তাকে মেরে ফেলা হয়। আর একটা মেয়েলোক তার সৎ ছেলেকে মেরে ফেলেছিল, বলে আমাদের লোক ঐ মেয়ে লোকটাকে গুলি করে নদীতে ফেলে দেয়। আর বল্লেন, তার আপন ফুফাত ভাই নাম গিয়াসুদ্দিন সে মুক্তিফৌজ হয়ে আর্মস হাতে পেয়ে যখন ডাকাতি শুরু করল তখন অন্য মুক্তিফৌজরা তাকে গুলি করে মারে।

নূর হোসেন সাহেব বললেন, "জনাব আঃ ওহাব আমাদের খবর দিয়েছিলেন তাকে (এ গিয়াসুদ্দিকে) ধরার পরে আমি যাইনি। গেলে তাকে উদ্ধার করে আনতে পারতাম। সে ভাই হলেও ডাকাতি করে বেড়াত বলে তাকে উদ্ধার করতে যাইনি।"

আর বললেন আমাদের পার্শ্ববর্তী মুলাদি থানার মাওঃ আঃ মজিদ সাহেব, সাং তেরচর, ইউঃ ছয়নল যাকে এলাকার লোক বলতো একজন সোনার মানুষ তাকে জয় বাংলা না বলার করণে কুদ্দুস মোল্লা নামে এক মুক্তিফৌজ যে ডাকাতি করে বেড়াত সে ধরে এনে মুলাদি ঈদগাহের নিকট এক তালগাছের সঙ্গে বেঁধে তাকে ৮টি গুলি করে মারে। মারে তার ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী ও স্বজনদের সামনেই।

আর বললেন আশেপাশে কোন লোক মরার কথা শুনিনি। এছাড়া তিনি বললেন যে এসব লোক মরার সঙ্গে মুক্তি যুদ্ধের কোনই সম্পর্ক

islamirenesaandolon.blogspot.com

ছিলনা। রাজাকারদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন আমাদের এলাকায় ৫/৬ জন লোক রাজাকার ছিল, তারা ছিল বেকার। তারা রাজাকার হিসাবে চাকুরী নিয়েছিল মাত্র। তাদের কোন ইসলামী রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পর্ক ছিলনা। এমনকি আমাদের এলাকায় জামায়াতের কোন লোকই ছিলনা। বরং তখন ঐ মুলাদি থানার মাওঃ মজিদ সাহেবকেই জামাতের লোক বলে মানুষ জানত।

বহু জায়গার রাজাকারদের খবর নিয়ে জেনেছি যে, তারা কতক ছিল বেকার আর কতক ছিল চোর ডাকাত ধরনের লোক। ইসলামী আন্দোলনের সঙ্গে রাজাকারদের কোন সম্পর্কই ছিল না!

অবশ্য কোন কোন টাউনে ছিটে ফোটা ৩/৪ জন এমন রাজাকার ছিল যাদের সাথে ইসলামী কোন দলের কোন সম্পর্ক ছিল।

ঢাকা টাউনের রাজাকারদের খোজ নিয়ে দেখেছি তারা নাকি অধিকাংশই ছিল স্থানীয় ছেলে যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পাঞ্জাবীদের জুলুম অত্যাচার থেকে নিজেদের ঘর- বাড়ী, মাল-আসবাব রক্ষা করা আর গৌণ উদ্দেশ্য ছিল যদি লুটপাটের কিছু সুযোগ মিলে। শুনেছি ঢাকার স্থানীয় লোকদের নিকট থেকে। তবে ঐ যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে যখন আলবদর বাহিনী গঠন করা হয় তখনকার কথা শুনেছি, তা কোন ইসলামী দলের ছাত্রদের নিয়েই গঠন করা হয়েছিল।

আমার এখনো বিশ্বাস যে, জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ এখনো হয়তো এ খোঁজ কমই রাখেন যে, তখন এমন বহু রাজাকার ছিল যারা পূর্বে কোন দিন জামায়াতের নামই শোনেনি এবং তারা কোন দিনও জামায়াত সমর্থক নয় তারা ছিল যার যার এলাকার বেকার যুবক এবং নিকৃষ্টমানের মস্তান ধরনের। ৭০ এর নির্বাচনে ২/১ জন ছাড়া তারা প্রায়ই ছিল নৌকার ভোটার। কাজেই ১৬ই ডিসেম্বরের পরে তারা রাতারাতি সব চলে গেল মুক্তিফৌজে।

মুন্সিগঞ্জের কথা শুনেছি, সেখানে বহু রাজাকার ছিল কিন্তু ঐ এলাকার সাধারণ মানুষ তখনও জামায়াতে ইসলামীর নামটাও শোনেনি। সিংগা ইরেও ঐ কথা শুনেছি তারা জামায়াত চিনতই না কিন্তু সেখানেও রাজাকার ছিল। আমার এই বই পড়ার পর নেত্রকোনার বারহাট্রা থেকে জনাব আলহাজ ওয়াহেদ আলি সাহেব আমাকে লিষ্ট পাঠিয়েছেন। তিনি লিখেছেন বারহাট্টা এলাকা অথাৎ বারহাট্রার আশপাশের কয়েকটা ইউনিয়নের মধ্যে কোন কোন গ্রাম থেকে কতগুলি লোক মারা গিয়েছে তার একটা হিসাব। কিন্তু যেসব গ্রাম থেকে কোন লোক মরেনি সেসব গ্রামের নাম তিনি দেননি।

islamirenesaandolon.blogspot.com

১৯৭১ইং সানের স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে ও পরে নিহত ব্যক্তিদের নামের তালিকা

ক্রমিক	মৃত ব্যক্তির নাম	গ্রাম ও ঠিকানা
১.	হাজি মোঃ আপ্তাফ	গ্রাম ছালীপুরা
২.	মোঃ আঃ ছাত্তার	গ্রাম – কৈলাটি
৩.	মুখশেদ মিঞা প্রাঃ শিক্ষক	গ্রাম - কৈলাটি
৪.	মোঃ আঃ মজিদ	গ্রাম দারিয়াপুর, কাজি অফিস সহকারী
৫.	মোঃ মীর্জা হোসেন	বাগের হাট
৬.	চোধুরী আঃ রউফ	বাগের হাট থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা
৭.	মোঃ মিছবাহ্ উদ্দিন	দসাল গ্রাম-কালীগা
৮.	মোঃ আজিজ	গ্রাম-দশাল সমাজ সেবী
৯.	শানোগুল	গ্রাম-কালীগ
১০.	জয়নাল আবেদীন খান	গ্রাম- আসমা
১১.	আঃ ওয়াহেদ খান	আসমা
১২.	আঃ কাদের	আসমা
১৩.	ইঞ্জিল খান	এবং এ গ্রামের আরো ৩ জন
১৪.	মৌলভী মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান	গ্রাম দারুন সাহত
১৫.	মোঃ মিছির উদ্দিন আহমদ	দরুন সাহতা ইউপি কেরানী
১৬.	মোঃ খালেক	গ্রাম গোপালপুর
১৭.	সুরুজ আলি গং	লাউফ
১৮.	মশ্রব আলী	,,
১৯.	মেজবানুর বাপ	,,
২০.	আলাউদ্দিন	,,
২১.	জাহেদ আলী	,,
২২.	জাফর আলী	,,

islamirenesaandolon.blogspot.com

২৩. মোঃ শাহাব–উদ্দিন	চেয়ারম্যান মৌয়াটি
২৪. আঃ খালেক	মৌয়াটি
২৫. মিয়া সোহরাবের ছেলে	হরিতলা
২৬. ক্বারী সামছুদ্দিন	পালপাড়া
২৭. মফিজ উদ্দিন নূরুল্লাহ	”
২৮. মাতবর আলী	বোয়ালজানা
২৯. লিহাজউদ্দিন	”
৩০. সাধুর বাপ	”
৩১. লরা	আতানগর
৩২. আলেফ উদ্দিন	চাঁদপুর
৩৩. ছিদ্দিক আলী	”
৩৪. আবূ	শেনের পাড়া
৩৫. দত্ত	
৩৬. গনীর মা স্বামীর নাম পাঞ্জাব খাঁ	আসমা
৩৭. শাহাবউদ্দিন চৌধুরী	মৌয়াটি
৩৮. সুরুজ আলি	গোন্দাপাড়া
৩৯. আরো একজন যার নাম মনে আসছে না	কৈলাটি
৪০. শমসের দাই	জিবনপুর
৪১. আজর আলি	গুমরিয়া

উপরে উল্লেখিত ৪৪ জনের মধ্যে মুক্তিফৌজদের হাতে মারা পড়েছে ২৬ জন এবং পাক বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে মারা পড়েছে ১৯ জন। আর সংবাদদাতার বাড়ী থেকে একটু দূরে মোহনগঞ্জের খবর যতটুকু তিনি রাখেন ততটুকু তিনি পাঠিয়েছেন যা এর পরে দেয়া হল। যার ৫ জনের মধ্যে ৩ জন মরেছে মুক্তিফৌজদের হাতে আর দুইজন মরেছে পাক বাহিনী বা রাজাকারদের হাতে। এভাবে যে সব সংবাদ বিভিন্ন জায়গা থেকে পাচ্ছি তা পরবর্তী সংস্করণের জন্য সংরক্ষিত রইল।

islamirenesaandolon.blogspot.com

মোহন গঞ্জ

১. আবুল হোসেন শেখ দেওয়ান

২. ঐ.....ছেলে

৩. নাম অজানা

৪. আঃ খালেক

৫. দাবীর উদ্দিন, মোহনগঞ্জ

তবে একথা সত্য যে ১৬ই ডিসেম্বরের পরে ও ১০ই জানুয়ারীর পূর্বে এই কয়টা দিন ছিল খুবই ভয়াবহ। এই সময়ের মধ্যেই লোক মরেছে বেশী। এই সময়ে পরাজিত গ্রুপটির জীবনের কোন নিরাপত্তা ছিলনা। যার প্রতিবাদে বিদেশীরা ও সোচ্ছার হয়ে ওঠেছিল এবং লন্ডন টাইমস-এও বিরূপ মন্তব্য করা হয়েছিল। আর এসব ঘটনা তো দেশের লোকই ভাল জানেন।

পরে সংগ্রহ করা কিছু অংশ নিচে দেয়া হলো যথাঃ

১৬ই ডিসেম্বরের পরের ঘটনা যা ঘটে মুক্তিফৌজদের দ্বারা তার কিছ হিসাব।

নারায়নগঞ্জ খানপুর দোতলা মসজিদের ইমাম জনাব, আঃ হক সাহেবের কাছ থেকে নেয়া তথ্য। এই ইমাম সাহেবের আপন চাচাত ভাই মৌলভী নিয়ামাতুল্লাহ সাহেবকে জ্যন্ত কবর দিয়ে মাটি চাপা দেয়। আল্লাহ হায়াতের মালিক, মাটির চাকা গুলি বড় বড় যার ভিতর দিয়ে কিছু বায়ুঢোকার পথ ছিল। তাকে জ্যান্ত চাপা দিয়ে চলে তাড়াহুড়া করে চলে যায় মাটি সরিয়ে। পরে তাকে জ্যান্তই উদ্ধার করা হয়। তবে ১টা চোখে মাটির এমন আঘাত লাগে যে সে চোখটা অন্ধ হয়ে গেছে।

এই লোকটি এখনও বেচেঁ আছেন। তার অপরাধ তিনি একজন আলেম ছিলেন। এছাড়া তাঁর আর কোন দোষ এলাকার কেউ বলতে পারেনাই। তার পিতার নাম মরহুম মৌলভী রহমাতুল্লা। সাং বদরপুর (মৌলভীবাড়ী), পোঃ ডালুয়া থানা- লাঙ্গলর্কোট, জেলা - কুমিল্লা।

ঢাকা ইউনিভারসিটির কলা বিভাগের (৯২তে) ৩য়বর্ষের একজন ছাত্রী নাম হুসনি আক্তার আমার বাসার একটা মেয়েকে প্রাইভেট পড়ায়। তার কাছে শুনলাম তার পিতার নাম মোঃ আনোয়ার হোসেন, সাং উত্তর সুদেবপুর, উপজেলা রামগঞ্জ, জেলা লক্ষীপুর।

islamirenesaandolon.blogspot.com

তার আপন চাচাত ভাই মাহমুদ হোসেন ছিল রাজাকার। সে পূর্বেও ছিল আঃলীগার এবং বহু লোককে খুন করেছে। বল্লু তার আপন চাচাত বোন হুসনি আক্তার। সে কিন্তু জানেনা যে সে যা বলছে তার অগচোরে তার কথাগুলি লেখা হয়ে যাচ্ছে। জানলে সে জানের ভয়ে নিশ্চিয়ই বলতনা।

কিছুদিন পূর্বে বগুড়ার নন্দীগ্রাম থানায় খোঁজ নিয়ে আসলাম। ঐ থানায় নাকি ২১২ টা গ্রাম আর ইউনিয়ন ৫টা যথাঃ- ১। বরুইল ২। নন্দীগ্রাম ৩। ভাটরা ৪। থান্ডা ৫। ভাটগ্রাম। এর মধ্যে ১নং ৩নং ও ৫নং ইউনিয়নে আমি নিজে গিয়ে স্থানীয় লোকদের নিকট থেকে জানলাম ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে ভাটরা ইউনিয়ন থেকে ২জন এবং ভাটগ্রাম ইউনিয়ন থেকে ৪/৫ জন হিন্দ মারা গেছে।

এছাড়া ১৬ ই ডিসেম্বরের পূর্বে ২১২টা গ্রাম থেকে কেউ মরেনি তবে ১৬ই ডিসেম্বরের পরে মুক্তিফৌজের হাতে কিছু লোক মারা গেছে। শুনলাম কাহালু থানা থেকে তৎকালীন জামায়াতী সংসদ সদস্য আঃ রহমান ফকীর ঐ থানা থেকে কাউকে ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে মারতে দেয়নি। তবে ১৬ই ডিসেম্বরের পরে সৈয়দ আলী নামক মুক্তিযোদ্ধা ১ দিনে ৬০জনকে হত্যা করে।

ঐ এলাকার হোসেন আলী মুক্তিযোদ্ধাও বহু লোক হত্যা করে। এরও কিছুদিন পূর্বে গিয়েছিলাম চাঁদপুর জেলায় জেলা শহরের মাইল পাঁচেক উত্তরে বিষ্ণুপুর ইউনিয়নের ঘেরুরিয়া গ্রামে ওয়াজ করতে। আমার অভ্যাস মুতাবিক সেখানেও কিছু ৭১ এর খবর সংগ্রহ করলাম। জিজ্ঞাসা করলাম এই এলাকা থেকে৭১-এ ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে কত লোক মারা গিয়েছে। যাদের নিকট জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাদের একজনের নাম নূরুল আবসার (বাবুল)।

তারা বললেন তাদের আশ-পাশের কোন ইউনিয়নে পাক বাহিনী প্রবেশ করেনি। তারা কয়েকটা ইউনিয়নের নাম বললেন সেগুলি হচ্ছে , আশিকাঠি, কল্যাণপুর ও বিষ্ণুপুর ইউনিয়ন, তিনটে ইউনিয়নে তো কম গ্রাম নয় কমপক্ষে ৪০টি গ্রাম তো হবেই। তারাই বললেন যে পাক বাহিনী ঐ এলাকায় ঢোকেই নাই। তবে তারা বলল ঐ এলাকার যারা শহরে বাস করতেন তাদের ভিতর থেকে ২/১জন লোক মারা গিয়েছে। কেউ কেউ বললেন, আমরা পাঞ্জাবীদের চেহারাই দেখিনি। আরও শুনলাম ঘেরারিয়া গ্রামে শফিক পাঠান ও হজরত আলি পাঠানদের বাড়ীতে ছিল মুক্তিফৌজদের ক্যাম্প। তারা বাইরের কিছু লোক ঘরে এনে ঐখানে মারে তবে তাদের আনা হতো ভিন্ন এলাকা থেকে এবং তা ১৬ই ডিসেম্বরের পরে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

বলুন এই যদি দেশের বিভিন্ন এলাকার লোক মারার হিসাব হয় তাহলে ৩০(লাখ) লোক মরার কথাটা কি ঠিক? এছাড়াও বাম রাম পন্থীরা প্রচার করছে যে, পাকবাহিনী ও তাদের সহযোগীরা এদেশের ২ লাখ মা- বোনের ইজ্জত হরণ করেছে। এই কথাটা কতটুকু সত্য হতেপারে এটাও চিন্তা করা দরকার।

আমি জানি আমাদের যশোরে এরূপ কোন ঘটনা ঘটেনি। মাগুরা নাড়াইল, ও ঝিনেদায় এরূপ ঘটনা ঘটেনি। নওগায় মহাদেবপুর, মান্দা ও সদর থানায় এরূপ ঘটনা ঘটেনি। নলছিটি, ঝালকাটি এইরূপ কোন ঘটনা ঘটেনি। চট্টগ্রাম লোহাগাড়া থানায় গিয়ে শুনেছি সেখানেও এরূপ কোন ঘটনা ঘটেনি।

আমি যে সব এলাকায় ওয়াজ উপলক্ষে গিয়েছি এবং লোকদের মনে করে জিজ্ঞাসা করেছি সেই সব এলাকার কথাই বলছি। ভোলায় পাকসেনারা একটা হিন্দু মেয়েকে ধর্ষনের ঘটনা গুবজ হিসাবে শোনা গেছে আর বগুড়ার নন্দীগ্রাম থানার ৫ নং ভাটরা ইউনিয়নের ৪/৫ টা হিন্দু মহিলাকে পাকসেনারা ধরে নিয়ে নাকি ধর্ষণ করে। এছাড়াও এরূপ ঘটনা কয়েক জায়গায় ঘটেছে বলে খবর কানে এসেছে।

তাই বলে এই সংখ্যটা ২ লাখ হতে হলে কি লাগে তা কি কেউ চিন্তা করে দেখেছেন। বাংলাদেশের ৬৮৩৮৫ টি গ্রাম থেকে ২লাখ মা বোনের ইজ্জত হরণ করলে প্রতি গ্রামে গড়ে প্রায় ৩ জন জন মছিলার ইজ্জত হরণ করা লাগে, কিন্তু কার গ্রাম থেকে কোন ২জন মহিলার ইজ্জত হরণ করছে তিনি একটু আমাকে আমার প্রকাশকের ঠিকানায় জানাবেন কি?

বাংলাদেশের লোকের একটা সুনাম আছে যে এরা হুজেগে বাংগালী। তাই বলে এমন নিরেট বোকা কি কেউ আছে যে তাকে ২লাখ মা বোনের ইজ্জত হরণের কথা বললেই মানুষ তা মেনে নেবে? আর টাও তো চিন্তা করা উচিত যে এতে (দুই লাখ) মা বোনের ইজ্জত হরণ করলে আমারও তো মা বোন এই ২ লাখের মধ্যে একজন হয়ে পড়তে পারে। এ সব চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যারা এরূপ কথা আজ ২১ বছর ধরে বলে বেড়াচ্ছে তাদের মান ইজ্জতের কোন ভয় আছে বলে আমার তো জ্ঞানে ধরে না। বরং এইটাই উচিত যে কারো পরিবারে ঘটনাক্রমে যদি এরূপ কোন ঘটনা ঘটেই কিংবা যা ২/১টা ঘটেছে তা নিয়ে এত বাড়াবাড়ি এটা কি কোন সম্মানী লোকের মুখে প্রচার করা শোভা পায়।

islamirenesaandolon.blogspot.com

অবশ্য তারা যে ২/১ জায়গায় এরূপ করেছে তা তো আমরা সবাই শুনেছি কিন্তু সে সংখ্যা কি দুইলাখ হবে? আপনি যে কোন একটা জেলাকে বেছে নিয়ে খোজ নিয়ে দেখেন এইরূপ ঘটনা কয়টা ঘটেছে। তাহলে দেখবেন সেখানে ২০০০০০ লাখের থেকে ০ (শূন্য) ডান পাশ থেকে কেটে তিনটে তো কাটা যাবেই এরপর যে সংখ্যাটা থাকবে তাও হিসাব করে পুরাতে পারবেন না। এটা নিশ্চিতই আমি বলতে পারি। আমার তো যতদুর বিশ্বাস তাতে এ সংখ্যা ১০০ পুরবে বলেও মনে হয় না।

হ্যাঁ তবে আমি যেহেতু এ সব সংগ্রহ করার জন্য কোন দায়িত্বশীল নই। তাই যে এলাকায় গিয়েছে সেখানে কিছু লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করেছি। করেছি এই জন্য যে ৩০ লাখ সংখ্যাটা আমার নিকট অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে। তাই কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তবে শোনা কথার ১০০% ঠিক, এটা আমার দাবী নয়। কিন্তু সঠিকের অনেকখানি কাছাকাছি হবে বলে বিশ্বাস করি। সম্ভবত ঃ আপনারাও তাই বিশ্বাস করেন।

অবশ্য এছাড়া ও আরও বহু জায়গার খবর রাখি যা লিখে অযথা বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাইনা। এটা একটা মুটামুটি হিসাব মাত্র। যার থেকে ঐ সময়কার একটা কাছাকাছি হিসাব অনুমান করা যাবে। তবে এটা ঠিক যে, এখনও যদি কোন দলের বা সরকার এর সঠিক হিসাব পেতে চান তবে তাদের জন্যে বড় জোর এক সপ্তাহ সময় লাগতে পারে হিসাব সংগ্রহ করতে। এখনই যদি একটা প্রোফরমা তৈরী করে প্রতি ইউ,পি চেয়ারম্যানের নিকট দেয়া যায় তা পুরণ করে দেয়ার জন্যে তাহলে এক সপ্তাহের মধ্যেই সঠিক হিসাবটা পাওয়া যেতে পারে। এতে পাওয়া যাবে কোন সময় কাদের হাতে কত লোক মারা গিয়েছে। কিন্তু তা করবে কি কেউ?

(এইটাই যখন বাস্তব অবস্থা তখন ৩০ লাখ বা তার কাছাকাছি একটা সংখ্যা কি করে হতে পারে? হা তবে শুনেছি এই সংখ্যাটা নাকি এসেছিল রাশিয়ার প্রভদা ও ইজভেসতিয়ার বিশিষ্ট সাংবাদিকের নিকট থেকে। শুনেছি এ সংখ্যাটা আওয়ামীলীগের কেউ দেয়নি এবং ভারতের কেউ দেয়নি। যদিও ভারত জানত যে সংখ্যাটা বড় করেই দেখাতে হবে।)

যা হোক, এর পরও আমার দাবী- আমার বই প্রকাশিত হওয়ার পর যেসব এলাকার সঠিক তথ্য আমাকে লিখে জানাতে পারেন কিংবা খবরের কাগজের মাধ্যমেও পেশ করতে পারেন অথবা বই লিখেও সঠিক হিসাব দিতে পারেন। তবে নকশালদের মারা বাদ দিবেন কারণ তার সঙ্গে দেশ মুক্ত

islamirenesaandolon.blogspot.com

করার কোন সম্পর্ক ছিল না। এর সবকিছুর জন্যেই পাঠক পাঠিকার পূর্ণ অধিকার রয়েছে। আমি চাচ্ছি তাই যে হিসাবটা যথা সম্ভব সঠিক বা সঠিকের কাছাকাছি হোক যেন অসত্য ইতিহাসে পরবর্তী বংশধরগণ বিভ্রান্ত না হয়। (আর নকশালরা আওয়ামীলীগদের ও মেরেছে কাজেই তাদের কথা বাদ)

প্রশ্ন ঃ এ সংখ্যাটা এত বড় করে দেখানোতে কি লাভ হয়েছে?

উত্তর ঃ এতে ইসলাম পন্থীদেরকে কমিউনিষ্টদের চাইতে অনেকগুণে বেশী নৃশংস ও হিংস্র হায়নার দল প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যেন ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যারা ৭১ এর ঘটনাবলী নিজ চোখে দেখেনি তারা যেন ইসলাম পন্থীদের ঘৃণা করে এবং তাদের কথা ভবিষ্যতে যেন আর কেউ না শোনে। এতেই তো তাদের লাভ। তাছাড়াও আরেকটা লাভ হচ্ছে ,এই যে বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবী যাদেরকে বড় হত্যাকারী হিসাবে জানে-যেমন হিটলার ও আইকম্যান বিশেষ করে আইকম্যানই বর্তমান সময় পর্যন্ত পৃথিবীর সবচাইতে বড় হত্যাকারী বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু ষ্টালিনের ২ কোটি লোক হত্যার কাহিনী ফাঁস হওয়ার পরে ষ্টালিনই এখন ১নং এ উঠে গেছে। তার চাইতে বড় হত্যাকারী হিসেবে এদেশের ইসলাম পন্থীদের চিহ্নিত করা। এটাও ছিল তাদের কুমতলব, এটা কি কম লাভ?

প্রশ্নঃ ঐ সময় যারা মরেছিল তারা সবাই কি দেশকে মুক্ত করার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল?

উত্তর ঃ ঐ সময় যারা প্রাণ দিয়েছিল তাদেরকে ৭ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যথাঃ

১. ঐ সময় যেহেতু দেশে কোন আইনের শাসন কায়েম ছিলনা ঐ সময় এ দেশে নকশালী তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়েছিল বেশ বড় আকারে। তারা গ্রামবাসীর সহানুভূতি কুড়ানোর জন্যে প্রথম মেরেছে এলাকার চিহ্নত নামকরা চোর ডাকাতদের, বিশেষ করে গরু চোর মেরে তারা জনগণের কাছে বেশী প্রিয় হয়ে উঠেছিল। পরে তারা মারা শুরু করল গ্রাম্য প্রধানদের, চেয়ারম্যান, মেম্বার ও আলেম ওলামাদের।

তখন থেকে তারা জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলল। বরং তখন তারা মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকার উভয় পক্ষেরই শত্রু হয়ে পড়ল। তবে ঐ সময় তাদের হাতে যত লোক মরেছে তার অর্ধেকেরও কম লোক মরেছে মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারদের হাতে। এটা অন্য জেলার বেলায় কতটুকু সঠিক তা বলতে না পারলেও যশোরের মাগুরা, ঝিনাইদাহ, কালিগঞ্জ বাঘারপাড়া

islamirenesaandolon.blogspot.com

ইত্যাদি এলাকার জন্যে যে সঠিক এতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বিশেষ করে কালিগঞ্জ, শালিখা ও বাঘারপাড়া থানায় ঐ সময় যত লোক মরেছে তার মধ্যে কম হলেও ৮০% লোক মরেছে নকশালদের হাতে। যার সাক্ষী ঐ এলাকার প্রতিটি মানুষ।

২. আর কিছু লোক মরেছে গ্রাম্য দলাদলির কারণে, যারা রাইফেল হাতে পেয়েছে তারা তাদের প্রতিপক্ষকে নির্মূল করার চেষ্টা করেছে।

৩. কিছু নিরীহ লোক মরেছে রাইফেলধারীদের দেখে আন্দাজেই ভয়ে দৌড় দিয়েছে আর রাইফেলধারীরা তাদের শত্রু মনে করে গুলি করে মেরেছে, তারা কম বুদ্ধির ভীতু লোক ছাড়া আর কোন দোষই তাদের ছিলনা। আর তাদের কোন পক্ষাপক্ষিও ছিলনা।

৪. কিছু লোক মরেছে পাঞ্জাবীদের সন্দেহ ভাজন হওয়ার কারণে পাঞ্জাবীদের হাতে। এদের মধ্যে ইসলাম পন্থীও ছিল।

৫. কিছু লোক মরেছে পাকপন্থী হওয়ার কারণে রুশ ভারত পন্থীদের হাতে।

৬. কিছু লোক মরেছে রুশ ভারত পন্থী হওয়ার কারণে পাক পন্থীদের হাতে।

৭. কিছু লোক মরেছে সরাসরি যুদ্ধ ক্ষেত্রে।

এখন প্রশ্ন এদের মধ্যে কারা মরেছে দেশকে মুক্ত করার জন্যে? এর জবাবে বলতে হবে যারা

১. নকশালদের হাতে যারা মরেছে তাদের সঙ্গে স্বাধীনতা যুদ্ধের কোনই সম্পর্ক ছিলনা, কাজেই তাদেরকে এই গণনার মধ্যে আনা যাবে না।

২. যারা গ্রাম্য দলাদলির কারণে মারামারি করে মরেছে তারাও এর মধ্যে গণ্য হতে পারে না।

৩. যারা নিরীহ লোক ভয়ে দৌড় দিয়েছে তাদের গুলি করে মেরেছে এদেরকেও গণনা করা ঠিক হবে না। কারণ তারা কোন পক্ষ বিপক্ষ বুঝতো না, তারা শুধু রাইফেলধারী লোকদেরকে ভয় করত মাত্র।

৪. দেশ মুক্ত হওয়ার পর পাকপন্থী বা বিহারী হওয়ার কারণে যাদেরকে ঘর থেকে ধরে এনে মারা হয়েছে এবং যারা জয় বাংলা না বলার কারণে মরেছে তারা তো অবশ্যই দেশকে মুক্ত করার জন্যে পাঞ্জাবী বা রাজাকারদের হাতে মরেনি। কাজেই তাদেরকেও গণনায় আনা যাবে না।

islamirenesaandolon.blogspot.com

শুধুমাত্র যারা পাঞ্জাবীদের ও রাজাকারদের হাতে আওয়ামী লীগের বা মুক্তিফৌজ বা পাক বিরোধী কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দিয়েছেন তাদেরকেই বলা যাবে যে তারা দেশকে স্বাধীন করার জন্যে সত্যই রক্ত দিয়েছেন।

আর এ সংখ্যাটা কত হবে? আপনারা পাঠক পাঠিকাগণই বলুন এ ধরণের জীবন দেয়া লোক প্রতি ইউনিয়ন থেকে ক'জন করে পাওয়া যাবে? কী মনে মনে হাসছেন না, ভাবছেন? অথচ সারা দুনিয়াকে দেখান হলো ৯ মাসে ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে। কোন দায়িত্বশীল ব্যক্তি এত বড় অসত্য কি করে মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন তা আমার মাথায় ধরে না।

হ্যাঁ, তবে একথা ঠিকই যে, যারা সত্যিকার অর্থে পাঞ্জাবীদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যে জীবন দিয়েছেন তারা সংখ্যায় যাই হোক না কেন, এ দেশের স্বাধীনতার গৌরব তাদের জন্যেই সংরক্ষিত। এছাড়া আর যারা জীবন দিয়েছেন তারা আসলে জীবন দেননি তাদের জীবন কেড়ে নেয়া হয়েছে। এর সাক্ষী এ দেশেরই গণমানুষ। তাদেরকে পরাজিত ও নিরস্ত্র হওয়ার কারণে মারা হয়েছে।

আমি নিজে দেখেছি দেশ মুক্ত হওয়ার পর যখন রাজাকাররা সারেন্ডর করল, এবং তাদের অস্ত্র মুক্তি ফৌজদের হাতে তুলে দিল তার পরও তাদের ধরে ধরে মারা হয়েছে। সারেন্ডার করার পরও যে বিপক্ষকে মারা হয় এটার নজীর দুনিয়ার কোথাও না থাকলেও বাংলাদেশে আছে। আর শুধু মুখে দাড়ি ও মাথায় টুপি থাকার কারণে বাস ট্রেন লঞ্চ স্টীমার থেকে ধরে নিয়ে মারার নজীরও এই বাংলাদেশেই আছে। তার লক্ষণ যে ভাল ছিলনা তা আজ ১৮ বছর পরও মানুষ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে। বিশেষ করে এই উপলব্ধিটা সম্প্রতি আরো চাঙ্গা হয়ে উঠেছে এই স্বাধীন বঙ্গ ভুমির আন্দোলন দেখে।

এখন গ্রামের নিরীহ লোকদেরও কানে পানি ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে। যেখানে হিন্দু মুসলমান এক মায়ের ছেলের ন্যায় মিলে মিশে রয়েছে সেখানের একটি হিন্দুও মনে করে না যে আমরা কোন দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি। সেখানে ৩৫ হাজার হিন্দু ভারতে যাওয়ার খবর হিন্দু নির্যাতনের আজগুবি আবিষ্কার, স্বাধীন বঙ্গ ভুমি আন্দোলনের।

এ সবই একই পরিকল্পনার পর্যায়ক্রমিক অংশ বিশেষ তা আজ আর কারো বুঝতে বাকি নেই। আজ বাংলাদেশের বড় দরদী বলে দাবীদার একটি দল যারা ফারাক্কার বিরুদ্ধে আজও মুখ খোলেনি, উজানের নদীগুলোর উৎস

islamirenesaandolon.blogspot.com

মুখে বাঁধ দেয়ার ব্যাপারে টু শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি, বাংলাদেশের ছিটমহল গুলোতে প্রবেশের পথ অর্থাৎ তিন বিঘা জমি বাংলাদেশের দেয়ার ব্যাপারে একেবারেই নিরব, যারা তালপট্টি ভারতের দখলের প্রতিবাদে একটি কথাও উচ্চারণ করেনি তাদেরই একটা অংশ ভারতে বসে আজ স্বাধীন বাংলার স্বপ্ন দেখছে।

এই মহলটির সাথে ৭১-এ একমত হতে না পারাই তো ছিল জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলাম পন্থী দলগুলোর একমাত্র অপরাধ আর এ কারণেই শহীদ হতে হল আওলাদে রাসূল মাওঃ মাদানী আর বাংলার গৌরব মাওঃ আতাহার আলি সাহেবকে, বৃদ্ধ বয়সে নির্যাতিত হতে হল রুশ ভারতের দালালদের হাতে। জাতি আজ এসব কথা চিন্তা করতে শিখেছে। ভবতেও শিখেছে যে এর পরিণতি কি হওয়ার আশংকা সামনে।

আজ যদি একটা সঠিক হিসেব নেয়া যায় যে প্রকৃত পক্ষে এ দেশকে পাঞ্জাবীদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে কত লোক জীবন দিয়েছে এবং পাক সরকারের সঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণার কারণে বিদ্রোহী হিসাবে কয়জন জীবন দিয়েছে তাহলে যে সংখ্যাটা আসবে তাতে কম করে হলেও একটি মৃত আত্মাকে লজ্জিত হতে হবে যে আমি সারা দুনিয়াকে কি ভুল তথ্যই না দিয়ে এসেছি।

একই অপরাধে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রই অপরাধী

পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রেরই খবর নিলে দেখা যায় তারা বিদ্রোহ দমনের জন্যে বিদ্রোহীদের এলোপাতাড়িভাবে হত্যা করে। যেমন এই বইয়ে রাশিয়ার ষ্টালিনের আমলের একটা খবর দেয়া হয়েছে তাতে দেখান হয়েছে তার আমলে সে দেশের কোটি কোটি লোককে হত্যা করেছিল। আফগান সরকার নাকি ইতিমধ্যেই ১৩ লাখ লোক মেরে ফেলেছে। এমনকি খোদ রাসূলের (সাঃ) দেশের সরকার ও বিদ্রোহের পূর্বাভাস মনে করে হজ্জের মাঠেই কত ইরানী হাজীদের মেরে ফেললো। ভারতও এ পর্যন্ত পাঞ্জাবে কম লোক মারেনি। চীনে কুম্যুনিষ্ট সরকার কায়েম করতে গিয়েও মেরেছে প্রায় দেড় কোটি লোক এবং এখানো মারছে।

এভাবে এমন কোন রাষ্ট্রের নাম আমার জানা নেই বা কোন রাষ্ট্রের কোন সরকারের নামও আমার জানা নেই যে কোথাও বিদ্রোহ ঘোষণার পর সেখান থেকে বিদ্রোহীদের মারে নাই ও মরে নাই। তবে বাংলাদেশের ব্যাপারে ঘটেছে কিছুটা ব্যতিক্রম। তা হচ্ছে এখানে যারা পাক সরকারের

islamirenesaandolon.blogspot.com

সঙ্গে বিদ্রোহ করেছিল তারা মরেছে খুবই কম। কারণ তারা প্রায় সবাই ছিলেন ভারতে আর যারা দেশে ছিলেন পাক সেনারা তাদের খুঁজে পেয়েছে ও কম। কাজেই তারা মারা পড়েছে খুবই কম। আর পাক সেনারা যাদেরকেই বিদ্রোহী মনে করেছিল তাদেরকেই মেরেছে বেশী।

যেমন উধারণ স্বরূপ বলব মাগুরার মোহাম্মদপুর থানার নহাটা ইউনিয়নের নারিন্দিয়া গ্রামের ১ টাই মাত্র পরিবার ছিল জামায়াতে ইসলামীর। সেই পরিবারের মাহবুব নামের একজন জামায়াত কর্মীকে পাঞ্জাবীরা গুলি করে মারে এবং তার পাশের বাড়ীর একটা নিরীহ ছেলে যে কোন দলের সঙ্গেই সম্পর্ক রাখত না তাকেও মারল পাঞ্জাবীরা গুলি করে। কিন্তু ঐ গ্রামের যারা আওয়ামী লীগের তাদের একটাকেও পাঞ্জাবীরা খুঁজে পায়নি।

ঝিকরগাছা থানার নিকটবর্তী লক্ষীপুর গ্রামে গিয়ে শুনলাম সেখানে পাক আর্মীরা গেলে যারা আওয়ামী লীগের ছিল তারা সব পালিয়ে যায়। আর যারা ছিল জামায়াতের লোক তারা পালায় নাই। তাদেরই ১৪ জনকে ধরে নিয়ে এক লাইনে দাঁড় করিয়ে গুলি করলে লাইনের মাঝ খানের ১ টা লোক আলৌকিকভাবে বেঁচে যায়। যাকে আমি নিজে দেখতে গিয়েছিলাম। তার নাম 'যশোর আলী' তার ভাই মাষ্টার গোলাম হোসেন একজন জামায়াত কর্মী এবং আমার খুবই ঘণিষ্ট বন্ধু। তার গোটা পরিবার এবং তার নিজের লোকগুলো এমন কি লক্ষীপুর ও তার পার্শবর্তী গ্রাম লাউজানির অধিকাংশ লোকই জামায়াত পন্থী। আমি যশোর আলীর কাছেই শুনলাম তার সঙ্গে আর যে, ১৩ জন গুলিতে মারা যায় তারা সবাই ছিল জামায়াত পন্থী।

এভাবে তারা অবিদ্রোহীদের বিদ্রোহী মনে করে যে ভুল করেছিল তার পরিণতিতে তারা এ দেশের অবিদ্রোহীদের হারাল যার কারণে মাত্র ৯ মাসের মধ্যেই তাদের সারেন্ডার করতে হলো। প্রকৃত পক্ষে ঐ সময় বেশীর ভাগ মরেছে নকশালদের হাতে বাদ বাকীর বড় অংশটা ইসলাম পন্থী ও বিহারী এবং কিছু নিরীহ লোক। আর খুবই কম মরেছে আওয়ামী লীগের লোক। এটা একেবারে দিবালোকের ন্যায় সত্য। সত্যকে সত্য বলে মানতে যাদের আপত্তি নেই তারা এ সত্যকে অবশ্যই সত্য বলে স্বীকার করবেন। তবে যারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করতে নারাজ তাদের কথা ভিন্ন এবং তাঁরা হচ্ছেন ভিন্ন ধাঁচের মানুষ। তাদেরকে বিদেশীরা না চিনলেও দেশের লোক অবশ্যই চেনেন।

islamirenesaandolon.blogspot.com

প্রশ্ন ঃ তাহলে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে ঐ সময় ইসলাম পন্থীরাই মরেছে বেশী এবং আওয়ামী লীগের লোক মরেছে খুবই কম।

উত্তর ঃ অবশ্যই আমি তা বলতে চাই। শুধু বলতে চাই তা নয়, বরং আমি গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গেই বলছি যে, মোট যত লোক মেরেছে পাঞ্জাবীরা, রাজাকাররা (যারা অবশ্যই আমাদের লোক ছিলনা) আর মুক্তিফৌজ, মুক্তিবাহিনী এবং রক্ষী বাহিনীর লোকেরা এদের হাতে মোট যত লোক মরেছে তাদের মধ্যে (নকশালীদের হাতে মরা বাদ দিলে) বড় জোর ১ থেকে ২ পারসেন্ট লোক মরতে পারে আওয়ামী লীগের লোক আর পরবর্তীতে মুক্তিফৌজরা যারা মরেছে তারা মরেছে শেখ মুজিবের খাস রক্ষী বাহিনীর হাতে। আমি তাদের কথা বাদ দিয়েই বলছি। রাজাকার এবং পাকবাহিনীর হাতে ১ থেকে ২% লোক মরতে পারে আওয়ামী লীগের লোক। আর বাদ বাকি যাদেরকে মেরেছে তারা হয়ত কোনই দলের না, একেবারেই নির্দলীয় নিরীহ অথবা ইসলাম পন্থী। আর আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, জামায়াতের কোন সদস্যের হাতে কিংবা তাদের হুকুমে ১টা লোকও মরেনি। তবে যারা সুযোগ সন্ধানী,জামায়াতের নাম করে জামায়াতের সঙ্গে ছিল তাদের কথা বাদ।

জামায়াতের কোন সদস্য যদি সত্যই কাউকে নিজ হাতে বা হুকুম দিয়ে মারতেন তবে অবশ্যই সে ব্যক্তি ১৬ ই ডিসেম্বরের পরে বেঁচে থাকতে পারতেন না। যেখানে দাঁড়ি টুপিওয়ালা লোকদেরকে বাস থেকে নামিয়ে নিয়ে মারা হয়েছে সেখানে প্রকৃত হত্যাকারীকে কি দেশের লোক ছেড়ে দিত? অবশ্যই তাকে ছাড়ত না। আমার জানা মতে ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে মাত্র ১ জন জামায়াত সদস্যকে খুলনা থেকে আঃ লীগের গুন্ডারা মেরে ফেলেছিল যার নাম ছিল মাওঃ হাতেম রশীদ। তিনি অত্যন্ত সৎ ও নিরীহ লোক ছিলেন তা সত্বেও তাঁকে শহীদ করা হয়েছিল।

পরে জামায়াতের লোকদের যুদ্ধকালীন সময়ের সহানুভূতিসূলভ ব্যবহারের কারণে বা চক্ষু লজ্জায় তাদের তো মারে নাই বরং তারা তাদের পাহারা দিয়েছে যেন অজানা অচেনা এলাকার কেউ এসে না মারে। জামায়াতের লোকদের বিরুদ্ধে যতই বিষ ছড়ান হোক না কেন প্রকৃত পক্ষে যে সময় আওয়ামী লীগের নেতাগণ নিজেদের জান বাঁচানোর জন্যে ভারতে গিয়ে পালিয়েছিলেন তখন সেই সব নেতাদের পরিবারের লোকদেরসহ দেশের নিরীহ লোকদের হেফাজতের পুরা দায়িত্বই নিয়েছিল জামায়াতের লোকগুলো।

islamirenesaandolon.blogspot.com

অবশ্য এমন কিছু লোকের খবর রাখি যারা পূর্বেও কোন দিন জামায়াতের ছিল না এবং পরেও তারা জামায়াতের নয়। কিন্তু ঐ সময় নিজেদেরকে জামায়াতের লোক পরিচয় দিয়ে কিছু অকান্ড কুকান্ড করেছে। যেমন উদাহরণ স্বরূপ বলব আমার নিজের ইউনিয়নের লোকমান মোল্লা নামে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করল, জান বাচাঁনোর জন্যে জন প্রতি জামায়াতকে কত করে চাঁদা দিতে হয়? আমি শুন তো অবাক। আমি বললাম এক পয়সাও দিতে হয় না। পরে লোকমান মোল্লা বললেন, কেন ওমুক ব্যক্তি যে এইরূপ চাঁদা আদায় করছে। আমি তক্ষুণি বললাম এরূপ কেউ চাঁদা চাইলে আমার নিকট ধরে নিয়ে আসবেন। এরূপ অপকর্ম কেউ কেউ করেছে পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছি যারা জামায়াতের নাম করে চাঁদা চেয়েছে তারা সবাই আঃ লীগের লোক। নাম বললে তারা লজ্জা পাবেন তাই নাম বললাম না।

প্রশ্ন ঃ জয় বাংলা না বলার কারণে যে লোক মরলোন তারা যদি জয় বাংলা বলতেনই তাহলে তেমন কি অপরাধ হত, এটা একটু বলবেন কি?

উত্তর ঃ জয় বাংলা কোন ইসলামী কথা নয় বরং এর মধ্যে রয়েছে শেরেকীর সংমিশ্রণ। যারা পরকালে বিশ্বাসী তারা জানেন শেরেকীর গোনাহ আল্লাহ মাফ করবেন না। তাই পরকালের অনন্তকালের আযাব থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে তারা জয় বাংলা বলেননি। 'জয় বাংলা শব্দটি সাধারণত 'নারায়ে তারবীর' আল্লাহু আকবার এর পরিবর্তে বলা হয়। কথাটার উৎপত্তি হয়েছে ভারত থেকে। তারা যেমন বলেঃ জয় মা কালি, জয় দুর্গা ইত্যাদি তেমনি ভাবধারা থেকে সৃষ্টি হয়েছে জয় বাংলা। আসলে আল্লাহর জয়টাই মুসলমানরা বলতে পারে। সেটাকে আমরা আল্লাহু আকবার বলে প্রকাশ করি। এর বিপরীত যদি 'জয় বাংলা' বলা হয় তবে প্রকৃতপক্ষে কি বলা হয় তা কি আমরা চিন্তা করে দেখেছি? হিন্দুরা বলে 'জয় হিন্দু' আর আমাদের বলতে শিখাল 'জয় বাংলা'। কাজেই যারা হিন্দু ভাবধারা গ্রহণ করার চাইতে মরা ভাল মনে করেছিলেন তারা 'জয় বাংলা বলার পরিবর্তে শহীদ হয়েছেন।

মানুষকে মরতেই হবে তা আজই হোক আর কালই হোক কাজেই সে মরাটা এমন হওয়া উচিৎ যে মরার পরের জীবনটা শান্তির জীবন হতে পারে। এই ধরণের ঈমান যে বাংলাদেশের মুসলমানদের মধ্যে আছে তা ৭১ এ প্রমাণ হয়ে গেছে। সেই সঙ্গে এটাও প্রমাণ হয়েছে যে, দেশের মাটিতে হাজার হাজার শহীদদের রক্ত ঝরেছে, সে দেশে আজ হোক আর কাল হোক

islamirenesaandolon.blogspot.com

ইসলাম কায়েম হবেই। আশা করি এটাই আল্লাহর মঞ্জুর আছে। প্রকৃত পক্ষে ভারত ও রাশিয়া পন্থীরা একাধারে যেভাবে মারা শুরু করেছিল যেন দেশটা ইসলাম মুক্ত হতে পারে। আর সেই মারার দোষটা ঘাড়ে চাপাল আমাদের।

প্রশ্ন ঃ বুদ্ধিজীবিদেরকে কারা হত্যা করল? এ সম্পর্কে আপনার ধারণা কি?

উত্তর ঃ আমরা যতদূর জানি তাতে ১০ ই ডিসেম্বর যখন পাক বাহিনীর অধিনায়ক জাতিসংঘের নিকট আত্মসমর্পনের প্রস্তাব দেন তখনই ঢাকা থেকে রাজাকার, আলবদর, আলশামস , এরা কে কোথায় পালাবে তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ১২ই ডিসেম্বরের মধ্যে ঢাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেয়ার চেষ্টা করে। একথা যাদের মুখে শুনেছি তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন মুক্তিযুদ্ধের ৯ম সেক্টর কমান্ডার মেজর (আবঃ) জয়নুল আবেদীন সাহেব।

নিরপেক্ষ ব্যক্তিদের সবাই বলেছেন ১৪ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ঢাকায় পাকবাহিনীর সমর্থক বাহিনীর সদস্য অর্থাৎ আলবদর, রাজাকার, আল শামস ইত্যাদি বাহিনীর কেউই প্রকাশ্য ময়দানে ছিল না। তারা সবাই তখন নিরাপদ স্থানে পালিয়ে যায়। এর বাস্তব প্রমাণ পাওয়া যায় ২ টি কারণ থেকে। যথা-

১. ১৬ই ডিসেম্বরের পর জহির রায়হানকে মারা।

২. বুদ্ধিজীবি হত্যাকাণ্ডের কোন তদন্ত রিপোর্ট পেশ না করা।

এর থেকে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের ধারণা এটা ছিল মিত্র বাহিনীর এক কুটিল চক্রান্ত। যার মাধ্যমে ইসলাম পন্থীদের দায়ী করা যায়।

প্রশ্ন ঃ বলা হয় পাক বাহিনী এবং তাদের দালালরা খুবই নৃশংসভাবে লোক হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? এবং আপনার কতদূর কি জানা আছে।

উত্তর ঃ পাক বাহিনীর লোকেরা যাকে সন্দেহ করেছে যে এ লোক হিন্দ বা ভারতপন্থী-তাকে গুলি করে মেরেছে। আর কাউকে মেরেছে- প্রথমে মেরে মেরে নির্জীব করে নিয়ে পরে গুলি করে মেরে ফেলেছে। এদের মারা এবং লুটপাট করা সবই ছিল খুবই নৃশংস অমানবিক। আর রাজাকাররাও কিছু মেরেছে সরাসরি গুলি করে আর এ দেশেরই কিছু উগ্রপন্থী যুবক রাজাকারদের চাইতেও নৃশংসভাবে লোক কিছু মেরেছে। অবশ্য তাদের অনেকেই পরে তওবা করে সৎ জীবন যাপন করছে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

যাদের বড় নৃশংসভাবে মানুষ মারতে দেখা গেছে তাদেরকেও মানুষ রাজনৈতিক কারণে শ্রদ্ধার নজরে দেখে থাকে। কারণ তারা বিজয়ী পক্ষ। তারা-

১. কাউকে মেরেছে- বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে আধা মরা করে বস্তার মধ্যে পুরে বস্তার মুখ বেঁধে পানিতে ফেলে দিয়ে।

২. কাউকে পুড়িয়ে মেরেছে।

৩. কাউকে গাছের সাথে বেঁধে চাঁদমারী করেছে। প্রথমে হাতে পায়ে চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত স্থানে গুলি করে হাত ঠিক করেছে। পরে সমস্ত দেহটাকে ঝাঝরা করে নদীতে ফেলে দিয়েছে।

৪. কাউকে পা উপরের দিকে দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে ব্লেড দিয়ে সারা শরীর চিরে দিয়েছে। তারপরও যে যেভাবে পারে আঘাত করেছে। এরপর মরার পূর্বেই বস্তায় পুরে বস্তায় মুখ বেঁধে নদীতে ফেলে দিয়েছে।

৫. কারও ছেলেকে ঘর থেকে এনে তার মা বাবার কাকুতি মিনতি উপেক্ষা করে নিষ্ঠুরভাবে তাদেরই সামনে জবাই করেছে। তারা একথা চিন্তা করেনি যে আমরাও মা বাবার সন্তান। যদি আমাদেরকে এভাবে কেউ জবাই করত তাহলে আমাদের কাছে কেমন লাগত, আর মা বাবা তা সহ্য করতেন কি করে।

৬. কাউকে হিন্দুদের পাঠ্যবলি দেয়ার মত বলি দেয়া হয়েছে। কাউকে পানি খেতে চাইলে প্রস্রাব করে খাইয়েছে এবং গাড়ির পিছনে পায়ের সংগে দড়ি বেঁধে চালিয়ে দিয়েছে আর এভাবে একটা জ্যান্ত মানুষকে মেরেছে।

৭. গভীর রাতে দলে দলে বিহারীদের ধরে রূপসা নদীতে লঞ্চে তুলে নিয়ে কচি দুধের বাচ্চাসহ এক ধারসে সবাইকে পেট ফেড়ে নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছে।

৮. বহু গণ্যমান্য আলেম, মাদ্রাসা শিক্ষক, স্কুল-কলেজও ইউনিভার্সিটির শিক্ষক, হাজী সাহেবান, হাফেজ-ক্বারী ও ইসলাম পন্থী বিভিন্ন গ্রুপের বহু লোককে জয় বাংলা না বলার কারণে নৃশংসভাবে মেরে ফেলা হয়েছে। শুনেছি নোয়াখালী জেলার কোন এক এলাকায় কয়েকজন হাফেজকে না মেরে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছে। তার মধ্যে মাইজদির এক কবর থেকে আল্লাহ আল্লাহ জেকেরের আওয়াজ পেয়ে জীবিত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল।

islamirenesaandolon.blogspot.com

শুনেছি ৩ শ্রেণীর লোকদের মারার পরিকল্পনা ছিল। যথাঃ

১. ধর্মভীরু।

২. মুসলমানদের বড় বড় অফিসার।

৩. উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান এদেরকে বেছে বেছে মেরেছে।

এভাবে যারা মেরেছে তাদের অনেকেই আল্লাহর গজবে পড়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে আর কিছু লোক যারা বেঁচে আছে তাদের অনেকেই তওবা করেছে। বহু কান্নাকাটি করেছে আল্লাহর দরবারে। আমিও তাদের জন্যে আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি আল্লাহ্ মা'ফ করুন এবং তারা যেটুকু অন্যায় করেছে তার চাইতে অনেক গুণ ভাল কাজ করে আল্লাহর রাজী খুশী অর্জন করুন।

প্রশ্ন ঃ এসব ছেলেরা কি করে বিভ্রান্ত হলো বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ তারা সৎ সঙ্গ পায়নি বরং পেয়েছে তার উল্টা সঙ্গ। তাদের এমন একটা বয়স ছিল, যে বয়সের ছেলেদের বিভ্রান্ত করা সহজ। তাছাড়া তাদের ব্যাপারে আমাদের ভুল কম ছিল না। আমরা এক দিকে ফতোয়া দিয়েছি ওরা ফাসেক, ওদের সাথে হাসি মুখে কথা বলা যাবে না। অপর দিকে ইসলামের শত্রুরা হাসি মুখে তাদের কোলে টেনে নিয়েছে। ফলে আমাদের ছেলেরা আমাদের শত্রুদের হাতের লাঠি নিয়ে আমাদের উপর আঘাত করেছে।

আমরা যদি সত্যই তাদেরকে ভালবাসতে পারতাম এবং যদি তাদেরকে আপন করে নিতে পারতাম তাহলে তারা অবশ্যই আমাদের হাতের লাঠি কেড়ে নিয়ে ইসলামের শত্রুদের উপর আঘাত হানত এবং কেউই তাদেরকে বিভ্রান্ত করতে পারত না। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ইসলামের শত্রুরা এই সব যুবক ছেলেদেরকে নিয়ে যা করতে চেয়েছিল তা তারা কিছুটা পারলেও পুরাপুরি পারেনি। তারা (ইসলামের শত্রুরা) অবাক হয়ে দেখেছে যে, ওরা যে মুসলমান তা ওরা ভুলে যায়নি।

ইসলামের শত্রুরা চেয়েছিল এরপর যেন এ দেশে আর দাঁড়ি টুপি ওয়ালা মানুষ না থাকে, মসজিদ মাদ্রাসাগুলো বিরান হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমান ছেলেদেরকে দিয়ে ওরা তা করাতে পারেনি। যদিও প্রথম দিকে না বুঝে কিছ করে ফেলেছে কিন্তু বহু মুক্তিফৌজ ও মুজিব বাহিনীর সদস্য পরে তওবা করে পুরো ঈমানদার মুত্তাকী হয়ে গেছে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

সুযোগ বুঝে ঐ সময় ইবলিশ মুসলমানদের মধ্যে একটা ধুয়া তুলে দিয়েছিল যে, মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই কিন্তু বাংগালী অবাংগালী ভাই ভাই হতে পারে না। আমরা তা মেনে নিয়েছিলাম। আমাদের বুঝাল, বিহারীরা তোমাদের শত্রু আর বিহারীদের বুঝাল বাঙালীরা তোমাদের শত্রু। যত পার বাংগালী মার। তারাও একথা বুঝল না আমরা মারব কাদের। এই বাংগালীরাই তো মুসলমান হিসেবে আমাদের আশ্রয় দিয়েছে এদের গায়ে হাত দেই কি করে।

অপর দিকে বাংগালী মুসলমানরাও একথা চিন্তা করেনি যে যারা তাদের মাতৃভূমি ছেড়ে মক্কায় মুজাহিদদের ন্যায় আমাদের দেশে মুহাজির অবস্থায় এসেছে, আমাদেরকে আপন এবং দ্বীনি ভাই মনে করে এবং আমরাও তাদেরকে দ্বীনি ভাই হিসেবে আশ্রয় দিয়েছে, আমরা কি করে তাদের গায়ে হাত দেই। এটা আমরা কেউই চিন্তা করিনি বরং এমন নৃশংসভাবে তাদের হত্যা করেছি যার নমুনা মনে হয় পৃথিবীর বিগত দিনগুলোতে কদাচিৎ ঘটেছে।

আমরা এমন নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়েছি যা বলতেও লজ্জা হয়। যেমন মাগুরার একজন এম, পি জনাব সৈয়দ আদর আলী সাহেবের এক বিয়াই অর্থাৎ ছেলের শ্বশুর ছিলেন বিহারী। এ বিহারী বেচারা বাচাঁর আশায় গিয়ে উঠেছিল বিয়াই বাড়ী মেয়ে জামাইয়ের কাছে। কিন্তু একমাত্র বিহারী হওয়ার কারণে তার জীবনটা আওয়ামী লীগের একজন এম, পি এর বাড়ীতেও বাঁচল না। এ লজ্জা ঢাকার কোন জায়গা আছে কি? আমি খালিশপুর বিদ্যুৎ কেন্দ গিয়ে একদিন শুনলাম বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ইঞ্জিনের বয়লারের মধ্যে বিহারীদের কচি ছেলেদের ছুড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে। আরও শুনেছি তা বলতে চাইনা। আমরাই করেছি এসব। এ লজ্জা কি ঢাকার কোন পথ আছে? হ্যাঁ মনে করি এর একটাই মাত্র পথ আছে তা হচ্ছে মাথায় সুবুদ্ধি আনা এবং আল্লাহর কাছে অঝর নয়নে কেঁদে কেঁদে মাফ চাওয়া।

ইবলিস এখানেই ক্ষ্যান্ত হয়নি। মুসলমানদেরকে এভাবে বুঝায়েছে যে মুসলমান মুসলমান ভাই ভাই একথা তো ঠিকই কিন্তু তাই বলে আওয়ামী লীগ ও জামায়াতের লোকেরা কি ভাই ভাই হতে পারে? তা পারে না কোন দিনও। প্রশ্ন তুলেছে যারা দেওবন্দি আলেম আর যারা আলীয়ার আলেম তারা কি ভাই ভাই হতে পারে? যারা শর্ষিণার মুরীদ আর যারা চরমোনাই মুরীদ তারা কি ভাই ভাই হতে পারে? আমরা তাদের কথাকে সমর্থন করে বলছি,

islamirenesaandolon.blogspot.com

তা কি করে পারে? তা পারে না দুনিয়া উল্টে গেলেও। এভাবে ইবলিস আমাদের ঘাড়ে চেপে আমাদেরকে আমাদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে কিন্তু আমরা তা টের পাইনি।

প্রশ্ন ঃ জামায়াত শিবিরের লোকদেরকে রাজাকার আলবদর বলে গালি দেয়া হয় কেন? এদের অপকর্ম কি ছিল? পঙ্গু রাজাকাররা কোথায়? বিস্তারিত বলবেন কি?

উত্তর ঃ প্রকৃত রাজাকার যে কারা এ নিয়ে জনমনে কিছু প্রশ্ন আছে। কারণ ৭১ এর পরে যাদের জন্ম হয়েছে এমন ছাত্র যারা ইসলামী ছাত্র শিবির করে তাদেরকেও রাজাকার বলা হয়। কাজেই এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে যে রাজাকার অর্থ কোন মতবাদ কিনা। কিংবা এমনও হতে পারে যে মীরজাফর অর্থ যেমন বিশ্বাসঘাতক তেমন রাজাকার অর্থ জামায়াত শিবির। আর ইয়াজিদ অর্থ কট্টোর ধর্মদ্রোহী তেমন জামায়াত শিবির অর্থ কট্টোর স্বাধীনতা বিরোধী, পাকিস্তানের দালাল।

আর যারা ইসলামী আন্দোলন করে রাজাকার বলতে যদি তাদেরকে বুঝায় তাহলে কর্ণেল ফারুক এবং তাদের দলের সবাই এবং ৯ম সেক্টার কমান্ডার (অবঃ) জয়নুল আবেদীন ও তার দলের সবাই এবং অন্যান্য যারাই কোন না কোন ইসলামী দলের সঙ্গে রয়েছেন তারা সবাই রাজাকার। তবে তাদের মধ্যে আমি নিজে একজন পুরান রাজাকার। আর যে সব শিবিরের ছেলেদের জন্ম হয়েছে ৭১ এর পরে তারা হচ্ছে নবীন রাজাকার।

আর পাক সেনাদের অধীনে যারা রাজাকার হিসাবে চাকুরী নিয়েছিল তারাই যদি হয় রাজাকার তাহলে সেখানে আমার কিছু কথা আছে। আমার প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, আজকের যারা ছাত্র তারা কেউই রাজাকার নয়, ঠিক তেমনই আজকের যারা ছাত্র তারা কেউই মুক্তিফৌজও নয়। কারণ ৭১ এ তাদের জন্মই হয়নি।

এরপরও জনমনে একটা প্রশ্ন আছে তা হচ্ছে আসল রাজাকার কারা এবং এত পঙ্গু মুক্তিফৌজ রয়েছে কিন্তু একটাও পঙ্গু রাজাকার নেই কেন? এবার এই দুটি প্রশ্নের জবাব দেব।৭১এ আমি প্রায়ই বাড়ীতে থাকতাম। একদিন শুনলাম আমুড়িয়া গ্রামের জামায়াত কর্মী ডাঃ জলিলকে ১৫/২০ জন নকশাল তার ঘরের মধ্যে ঢুকে দিনের বেলায় রামদা দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে। ঐ দিনই শুনলাম।

islamirenesaandolon.blogspot.com

নড়াইলের অধীন চারখাদা গ্রামের মাওলানা আঃ ওয়াদুদ (জমায়াত কর্মী) সাহেবকে রাত্রি বেলা ঐ নকশালরাই কুপিয়ে হত্যা করেছে। আমিও যেহেত ইসলাম পন্থী ছিলাম তাই এসব খবর শুনে বাড়ীতে বাস. করা নিরাপদ নয় মনে করে তার পরের দিনই যশোর শহরে গিয়ে উঠলাম। কয়েকদিন পরে দেখি বাড়ীর সবাই গিয়ে উঠেছে যাশোর।

এর কয়েকদিন পরে জুলাইয়ের শেষ সপ্তাহে দেখি আমাদের কুচিয়ামোড়া ইউনিয়নের কলাইভাঙ্গা গ্রামের সাদেক আহমদ আমার নিকট গিয়ে হাজির। জিজ্ঞেস করলাম কি খবর? বলল, আমাদের গ্রামে তো এক চাটিয়া সবাই আওয়ামী লীগার তারপর আবার আমরা আওয়ামী লীগের নেতা সোহরাব সাহেবকে দাওয়াত করে এনে একটা সোনার নৌকা উপহার দিয়েছিলাম। এ কারণে গ্রাম্য লোক এখন খুবই ভীত। এর পরও সেদিন নদী দিয়ে কয়েকটা লাশ ভেসে যেতে দেখে তো গ্রামের লোক একেবারেই ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে।

এরপর গ্রাম্য প্রধানগণ মিলে পরামর্শ করেছে, বাঁচতে হলে জামায়াত নেতা মাওলানা আবুল খায়ের সাহেবকে মাগুরায় আনতে হবে। আর এই জন্যই আপনার নিকট পাঠিয়েছে। এ খরব পেয়ে খুব তাড়াহুড়া করে মাগুরায় এসে বড়শলোই ও কালইডাঙ্গার গ্রাম্য প্রধানদের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভয় দিলাম।

যখন শুনলাম নিজনান্দুয়ালীর হিন্দুরা খুব ভীত হয়ে পড়েছে তখন ঐ গ্রামের নিতাই বাবুকে সাথে নিয়ে প্রত্যেকের বাড়ী বাড়ী গিয়ে তাদেরকে সাহস দিয়েছি যে আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের গায়ে কাউকে হাত দিতে দেব না। আমাকে দেখে যেন সবাই নূতন জীবন ফিরে পেলেন। তাদের খবরা খবর নিয়ে জানলাম তারা গ্রাম বাঁচানোর জন্যে তাদের যুবক ছেলেদের দুই দলে ভাগ করে একদল দিয়েছে রাজাকারে আর একদল দিয়েছে মুক্তিফৌজে শুনলাম যে সাদেক আহমেদ আমাকে আনতে গিয়েছিল তারই আপন ছোট ভাই ইজাহার গিয়েছে মুক্তিফৌজে।

আমি মাগুরায় পৌছে শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান জনাব পীর ওবায়দুল্লাহ সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম মাগুরায় রাজাকারের সংখ্যা কত। জবাবে বললেন ১১ হাজার। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম গত ইলেকশনে যেখানে আমরা মাগুরায় ৩৭ টি ইউনিয়ন থেকে ১০০ শত ভোটও পেলাম না সেখানে ১১ হাজার রাজাকার নেয়া হয়েছে এরা কারা? তিনি বললেন এদের মধ্যে ৩৫

islamirenesaandolon.blogspot.com

টি ছেলে আছে আমাদের অর্থাৎ জামায়াত ও মুসলীম লীগের আর বাকি সবাই হচ্ছে আওয়ামী লীগের; শুনে আমি তো অবাক হলাম যে, একি ব্যাপার!

পীর সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম এদের কেন রাজাকারে নিলেন। তিনি জবাব দিলেন-পাক সেনারা রাজাকারে ভর্তি হবার জন্যে আহ্বান করেছে আর যুবক ছেলেরা রাতারাতি জামায়াতী সেজে দলে দলে এসে চাকুরী নিয়েছে। শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান বললেন, এরা এখন যে সব অপকর্ম করে বেড়াচ্ছে তা রোধ করার ক্ষমতা আমার নেই।

হ্যাঁ তবে এ কথা আমি বলিনি যে, আমাদের যে সব ছেলেরা রাজাকারে ঢুকেছিল তারা সব ফেরেশতা ছিল। তাদের মধ্যেও ২/৪ জন এমন ছিল যাদেরকে পরে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। তারা এমনভাবে দেশ ছাড়া হয়ে গেছে যে তারা বেঁচে থাকলেও আর মাগুরায় কোন দিন ফিরে আসতে পারবে না। পরে বাকি রাজাকার বেশীর ভাগ মুক্তিফৌজে মিশে গেছে আর বাকিগুলো কেউ মারধোর খেয়ে বেঁচে আছে আর কেউ শেষ হয়ে গেছে।

শুনলাম, নিহত ডাঃ জলিল (জামায়াত কর্মী) সাহেবের এক ভাগনে আবুল হোসেন নামে এক রাজাকার ঐ ৩৫ জনের মধ্যে আছে। আমি তাকে (আবুল হোসেনকে) ডেকে জিজ্ঞাস, করলাম তোমার মামার হত্যাকারী বলে যাদের তুমি মনে কর তারা কারা? সে বলল তাদের কয়েকজন ভারতে চলে গেছে আর লাল মিয়া ডাক্তার এবং আরও ২/৩ জন গ্রামে আছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাদের উপর কি তোমার রাগ আছে ?

বললো আছেই তো। আমি সঙ্গে সঙ্গে লালমিয়া ডাক্তারকে এবং আর যাদের উপর আবুল হোসেনের আক্রোশ ছিল তাদেরকে ধরে এনে আমার বাসায় উঠালাম। দেখলাম ডাঃ লাল মিয়ার শ্বশুর রাতে বহু টাকা পয়সা নিয়ে আসছেন জামাইকে উদ্ধার করে নেয়ার জন্যে। আমি তাকে বুঝালাম জামায়াতের লোক ঘুষ খাওয়াকে অন্তর থেকেই হারাম মনে করে। আপনাকে একটি পয়সাও দেয়া লাগবে না। আমি তাদের এনেছি মারার জন্যে নয়, বাঁচানোর জন্যেই।

আমি জানি, যে কেউ এদের মেরে ফেললে লোকে বলবে ডাঃ আঃ জলিল হত্যার বদলা নিয়েছে। কিন্তু এভাবে বদলা নেয়া আমি জায়েজ মনে করি না। কারণ আমি নিজেও বিচারক নই এবং রাজাকাররাও বিচারক নয়। আর আমরা তো আদর্শ দিয়ে আদর্শের মুকাবেলা করতে চাই; রাইফেল দিয়ে নয়। লালমিয়া ডাক্তারের শ্বশুর টাকা পয়সা নিয়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

islamirenesaandolon.blogspot.com

(এভাবে কত জন যে টাকা এনে ফিরে গেছে তার কোন লেখা জোখা নেই। আমি এখনও বলছি যদি এক পয়সাও কেউ দিতে পেরে থাকে তবে সে প্রতিবাদ করুক।)

এ খবর ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। পরে শালিখা থানার নকশাল প্রধান নামে পরিচিত মাষ্টার আঃ মালেক বি, এস, সি গ্রাম মধুখালি, পোষ্ট পুলুম, জেলা মাগুরা, আমার নিকট লোক পাঠালেন যে, আমি একটু নিরাপত্তা চাই। আমি খবর পাঠালাম, আমার বাসায় চলে আসতে। দেখি পরের দিন সকাল ৯ টায় আমার বাসায় এসে হাজির। এ ধরনের ৭ জনকে বাসায় আশ্রয় দিলাম যাদের দেখা মাত্র গুলি করার কথা।

আমি বললাম আদর্শ নিয়ে আদর্শের লড়াই হবে, রাইফেল দিয়ে নয়। রাজাকারদের রিপোর্ট আনুযায়ী শেষ পর্যন্ত মাষ্টার আঃ মালেককে মিলিটারী অফিসারের নিকট যেতে হলো। আঃ মালেক সাহেবকে কিছু জিজ্ঞাসা করার পূর্বেই আমি মিলিটারী অফিসারকে বললাম রাজাকাররা যা বলবে আপনি তাই শুনবেন আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন না? অথচ আমি এখানে জামায়াত প্রধান এবং উপনির্বাচনে জামায়াতের প্রার্থী হিসাবে নির্বাচিত এম, পি, এ। আর আপনি কি জানেন এ সব রাজাকার কারা? ইতিপূর্বে আমরা দাড়িপাল্লায় যেখানে ৩৭ টি ইউনিয়ন থেকে ১০০ টি ভোটও পেলাম না সেখানে রাজাকার এগার হাজার। এরা কারা তা-কি আপনার জানা আছে।

ওরা সবাই নৌকা থেকে নেমে এসেছে। এর পর মাষ্টার আঃ মালেককে সঙ্গে করে নিয়ে আসি এসব কথাবার্তা তার সামনেই হলো। তাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা করতে না দিয়ে আমি রিক্সায় করে এনে বাসায় উঠালাম। ৩ মাস পর যখন ৬ই ডিসেম্বর মাগুরা মুক্তিফৌজরা দখল করে নিল তখন এই ৭ জন আমার বাসা ছেড়ে দেয়। যাহোক মাগুরা থাকা কালে একদিন দেখলাম ঐ সাদেক আহমদের ছোট ভাই ইজাহার আমার বাসায় গিয়ে হাজির। বলল, আমরা গ্রাম বাঁচানার জন্যে ভাগাভাগি করে কেউ গিয়েছি মুক্তিফৌজে আর কেউ গিয়েছি রাজাকারে। আমার মেঝে ভাই গিয়েছে রাজাকারে আর আমি আছি মুক্তিফৌজে।

দেখাল তার কাছে এক ইন্ডিয়ান পিস্তল। তারা জানত, আমি কারও জন্যেই ভয়ের পাত্র ছিলাম না, আমি তখন এটা দেখানোর সুযোগ পেয়েছিলাম যে মুসলমান কারও জন্যে ভয়ের পাত্র নয়; অব্য আমি তখনও অনেককে ইসলামী আদর্শের দুশমন মনে করতাম এখানে করি কিন্তু কখনও তাদের সঙ্গে

islamirenesaandolon.blogspot.com

রাইফেল দিয়ে মুকাবেলা করার পক্ষপাতি ছিলাম না এবং এইটাই ছিল কেন্দ্রীয় জামায়াতের হেদায়াত। এই হেদায়াতকে কতটুকু মেনেছি সেটা আমি বলতে পারব না, তবে আমার নিজস্ব ব্যাপার যেটা, তাই আমি বলছি।

একদিন কেবলমাত্র দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে হাত ধুয়ে ভাত মাখান শুরু করেছি এমন সময় খবর পেলাম প্রাইমারী স্কুলের কয়েকজন শিক্ষক বেতন নিতে এলে তাদের রাজাকাররা ধরে মারতেছে। যার মধ্যে আমুড়িয়া গ্রামের আঃ বারী সাহেব (জামায়াত কর্মী) কে ধরে রাজাকাররা মেরেছে যদিও তিনি জামায়াতের লোক। এবং তার টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে। ঐ একই গ্রামের মাষ্টার সদরুদ্দিন সাহেবকেও মেরে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে, শিরিশদিয়া গ্রামের হিন্দু মাষ্টার, গোলক বাবুকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে।

খবর শুনে তক্ষুণি ভাত রেখে দিয়ে যে খরব দিয়েছিল তার সাইকেলের রডের উপর বসেই দ্রুত ছুটে আসলাম। মাষ্টার আঃ বারী সাহেব (জামায়াত কর্মী) বললেন আপনি আর ২ মিনিট দেরী করে আসলে আমাদের জীবিত পেতেন না। মাষ্টার গোলক বাবুও আমাকে দেখে মনে হলো যেন নূতন জীবন ফিরে পেলেন। যে সব রাজাকাররা এই সব শিক্ষকদের ধরে এনে মেরেছিল এবং টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছিল তাদের ধরে এনে তাদের নিকট থেকে টাকা পয়সা উদ্ধার করে শিক্ষকদের ফেরত দিলাম- এবং ঐ রাজাকারদের মেরে তাড়িয়ে দিলাম।

আমি মাগুরায় থাকাকালীন সময় অর্থাৎ আগষ্ট মাস থেকে ৬ ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই সব রাজাকাররা যে সব দোষ করল তার সব দোষ গিয়ে চাপল আমাদের ঘাড়ে। কিন্তু চাপলে কি হয়। আমরা মাগুরার স্থানীয় ৩ জন জামায়াত সদস্য ছিলাম এদের একজনকেও মুক্তিফৌজরা গ্রেফতার করেনি। আর একজন সদস্য ছিলেন নোয়াখালীর। তিনি নোয়াখালী তার নিজ গ্রামে চলে যান।

তবে আমি যেহেতু একেবারে স্থানীয় জামায়াত প্রধান তাই আওয়ামী লীগ নেতা প্রায়ই পুলিশ পাঠাতেন আমাকে ধরতে। কিন্তু মুক্তিফৌজরা তাদের তারিয়ে দিত। আওয়ামী লীগ নেতা আমাকে হাজতে আনবেই। আমিও আসার জন্যে প্রস্তুত হলাম। এরপর দেখি আসরের নামায পড়তে পড়তে প্রায় ৩/৪ শত মেয়ে লোক এসে হাজির হয়ে গেছে। সে দিন যে সব মেয়েদের দেখেছিলাম তাদের একজন ছিলেন এক বৃদ্ধা জনাব কেরামত মুন্সির মা। তিনি বললেন, আমার ৭ ছেলের ৬ টাই মুক্তিফৌজ। আমরা জানি কে কেমন

islamirenesaandolon.blogspot.com

ভাল মানুষ। আমাদের বিপদের মধ্যে ফেলে যখন আমাদের নেতারা ভারতে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন যারা আমাদের উদ্ধার করলেন তারাই হলো দালাল? আর দেখলাম অনেক মেয়ে ছেলেদের চোখে পানি।

তাদের একজনকে দেখেছিলাম বেশী কাঁদতে সে ছিল হাফিজ মুন্সির স্ত্রী। তাদের সাথে আমার রক্তের কোন সম্পর্ক ছিল না তাদের সবাই ছিল বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ বা মুক্তিযোদ্ধাদের জয়া জননী। তারা বলতে লাগল মাওলানা সাহেব যদি দালাল হন আমরা সবাই দালাল, আমরাও যাব হাজতে ৩ জন পুলিশ শেষ পর্যন্ত আমাকে বললেন, হুজুর আপনি থানার বাইরে গিয়ে বাস করুন নইলে আমাদের চাকুরী থাকবে না।

কালোডাঙ্গার আকমাল বিশ্বাস এখনও বেঁচে আছেন। একদিন মাগুরায় গিয়ে আমাকে বললেন, বরইচারা মুক্তিফৌজদের ক্যাম্পে খাবার নেই, তারা কি না খেয়ে থাকবে? আমি বললাম, তারা তো আমাদেরই ছেলে তারা কেন না খেয়ে থাকবে? আমি কয়েক বস্তা রিলিফের আটা আকমাল বিশ্বাসের নিকট পাঠিয়ে দিলাম।

পরে দেখলাম যে সব রাজাকার রাইফেল হাতে পেয়ে লোক হত্যা ও লুটপাট করেছিল তারা সব ৬ই ডিসেম্বর মধুমতি নদী পার হয়ে ফরিদপুর ঢুকল আর বাকীগুলো সব মুক্তিফৌজে মিশে গেল। এইটাই ছিল তখনকার বাস্তব পরিস্থিতি। তখন আওয়ামী লীগের যেসব নেতৃবৃন্দ ভারতে গিয়েছিলেন তাদেরকে জিজ্ঞেস করে দেখুন তো তাদের পরিবারের কেউ মরেছে নাকি? পরে দেশ স্বাধীন হলো, প্রচার যন্ত্রের মালিক হলেন একটা গ্রুপ আর একটা গ্রুপের মুখে লেগে গেল তালা, তাই আসল ঘটনাটা কাল পর্দায় ঢাকাই পড়ে গেল।

জামায়াতের লোকদেরকে যদি দেশের লোক শত্রুই মনে করত তাহলে ১৬ ই ডিসেম্বরের পরে জামায়াতের একটা লোকেরও বাঁচার কথা ছিলনা। কিন্তু এরা বাঁচল কি করে? এটা কি দেশ বিদেশের লোক বুঝে না? বুঝে সবাই। তবে মুখে উচ্চারণ করতে পারে না। যেমন ভাসুরের নাম জানে সবাই কিন্তু বলেনা কেউ।

এরপর প্রশ্ন, পঙ্গু রাজাকার নেই কেন? এর কারণ কি আর নূতন করে বলতে হবে? পরে তারা তো সবাই মুক্তিফৌজের দলে ঢুকে পড়ল কারণ তারা তো ঐখান থেকেই রাজাকারে গিয়েছিল। বহু চেনা রাজাকারের হাতে আমি স্বচক্ষে মুক্তিফৌজের সার্টিফিকেট দেখেছি। কাজেই পঙ্গু রাজাকার এখন

islamirenesaandolon.blogspot.com

সবাই পঙ্গু মুক্তিফৌজ। হ্যাঁ, তবে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যারা সত্যিকার অর্থে ইসলামী ছাত্র সংঘের ছেলে ছিল আর যারা ছিল জামায়াত ও মুসলিম লীগের ছেলে কিংবা মাদ্রাসার ছাত্র তাদের উপর দিয়ে তো ১৬ ই ডিসেম্বরের পরে ছোট খাট কেয়ামত বয়ে গেছে। তাদের অনেকেই শহীদ হয়েছে।

এর পরের মজার ঘটনা হলো এই যে, যখন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এক এক করে দেশে ফিরতে লাগলেন তখন তাদের সহানুভূতি কুড়ানোর জন্যে এক এক জন গিয়ে নেতাদের সঙ্গে দেখা করেন আর বলেন স্যার, রাজাকাররা কিছু রাখেনি। সব শেষ করে দিয়েছে। তবে জানটা কোন প্রকার বেঁচে আছে। পরে একথাও শুনেছি যারা আমাদের বেশী বদনাম গাইতে পারতো নেতাদের কাছে তারাই বেশী বেশী বাহবা পেত।

এরপরও মজার খরব হলো এই যে, খোদ শেখ সাহেবের ছোট ভাই শেখ নাসের সাহেবও আমার বাড়ীতে এক মাসের বেশী সময় লুকিয়ে ছিলেন। এরপরও আমরা রাজাকার ও দালালই থেকে গেলাম এবং স্বাধীন হওয়ার পরে বহু দুর্ভোগ পোহাতে হলো। হ্যাঁ, তবে কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে, রাজাকার নামটা বাদ দিয়ে এখন মৌলবাদ বলছে তাদের বাপদাদারাও যে মৌলবাদী তা হয়ত ভুলেই গিয়েছে।

মুক্তি যুদ্ধ চলাকালে লোক আমাদের কেমন জানত?

উপরের বর্ণনা থেকে কয়েকটা জিনিস পরিস্কার বুঝা গেল । যথাঃ-

১. এ দেশের লোক তখন যেমন রাজাকার দেখে ভয় পেতো তেমন জামায়াত নেতাকে দেখে যেন হারানো জীবন ফিরে পেত।

২. পাঞ্জাবীদের গুলির মুখে এ দেশবাসীকে ফেলে রেখে যখন আওয়ামী লীগ নেতাগণ দেশের বাইরে ছিলেন তখন দেশবাসীর একমাত্র ভরসা ছিল জামায়াতের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণের উপর। এ কথা যদি কেউ মানতে রাজী না হন তাহলে আমি যাদের নাম ঠিকানা দিয়েছি তাদের নিকট পত্র দিয়ে জেনে দেখুন। জেনে দেখুন যে, সব আওয়ামী লীগের গ্রাম্য প্রধানগণ আমাকে যশোর থেকে মাগুরায় এনেছিলেন তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মোঃ ছোরমান বিশ্বাস- গ্রাম কলাইডাংগা ডাক-কুচিয়ামুড়া, জেলা মাগুরা- তিনি আমাকে দেখা মাত্র সোৎসাহে বলে উঠলেন (যশোরের ভাষায়)- এখন জানটা ধড়ে এলো।" আরও যাদের নাম ঠিকানা দিয়েছি- তাদের নিকট পত্র দিয়ে জেনে দেখুন যে- ঐ মুহূর্তে দেশের লোক আমাদের বন্ধু মনে করত না শত্রু মনে করত।

islamirenesaandolon.blogspot.com

৩. দেশের লোক যদি আমাদের শত্রুই মনে করত তবে আমরা তো ভারতে পালাইনি। আমরা দেশে রইলাম কি করে? আমাদের কি কোন যাদু-মন্ত্র জানা ছিল?

৪. এ দেশের লোক যারা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করে তারা এখনও মনে করে যে, এ দেশের স্বাধীনতা তাদের দ্বারা রক্ষা পেতে পারে যাদেরকে ভারত আশ্রয় দেবে না বা যারা ভারতে পলাতে পারবে না। কারণ তারা মনে প্রাণে বিশ্বাস করত যে, স্বাধীনতা বিপন্ন হলে ভারতের দ্বারাই হতে পারে। ভারতের আগ্রাসী নীতি ও চানক্য স্বভাব ভারত পরিবেষ্টিত বাংলাদেশের জন্য আশংকাজনক তা দেশপ্রেমিক প্রতিটি চিন্তাশীল নাগরিক আজও উপলব্ধি করছেন।

প্রশ্ন ঃ ৭১ এরপর থেকে মনে হয় যেন ইসলামপন্থী লোকদেরকে দেশের লোক শত্রু মনে করে– এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?

উত্তর ঃ কথাটা ঠিক এভাবে সত্য নয়। সত্য এই যে, ইসলাম পন্থীদেরকে শত্রু মনে করাবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ তাদেরকে শত্রু মনে করে না। মনে করেনি বলে তো জনাব রব সাহেবের দলের চাইতে জামায়াতে ইসলামী নির্বাচনে বেশী ভোট ও বেশী সিট পায়। দেশের লোক যদি তাদের শত্রুই মনে করত তাহলে–

১. ১৬ই ডিসেম্বরের পরে এরা বাঁচতেই পারতো না।

২. বাঁচলেও বাংলার মানুষের একটা ভোটও এরা কোনদিন পেত না।

৩. গোলাম আযম সাহেবও এতদিন দেশে টিকতে পারতেন না।

৪. মাওলানা মান্নান সাহেবও মন্ত্রী হতে পারতেন না।

৫. জনাব শাহ আজিজুর রহমানও এ দেশের প্রধান মন্ত্রী হতে পারতেন না।

৬. বহু উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু শিক্ষককে চাকুরী হারাতে হত।

৭. দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই শেখ সাহেবের শাসনামলে ১৯৭৩ সনের ডিসেম্বরে স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়নের অধীন ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান মেম্বারদের শতকরা ৬৫% জন ইসলামপন্থী প্রার্থী নির্বাচীত হত না। এ কথা কি কেউ চিন্তা করে থাকেন?

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমার এ দাবীর স্বপক্ষে মাত্র কয়েকটি যুক্তি দিচ্ছি যথা

১. যদি ইসলামপন্থী লোকদেরকে লোকে শত্রু মনে করত তাহলে ৭১-এর ১৬ই ডিসেম্বরের পরে তারা বাঁচল কি করে? তারা তো ভারতে বা পাকিস্তানে পালায়নি।

২. তারা এ দেশের, বিশেষ করে যার যার এলাকার চেনা জানা লোকদের ভোট পেয়ে মন্ত্রী হয় কি করে এবং এম, পি হয় কি করে?

তারা এ দেশের জন মানুষের ইমাম হয়ে নামায পড়ানোর অধিকার পান কি করে?

এছাড়াও আমি জানি যে, এ দেশের যে সব নেতা ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাদের পরিবারের লোকগুলোকেও হেফাজত করেছিল ঐ ইসলাম পন্থিরাই। তখনকার গোলযোগ মুহূর্তে ইসলাম পন্থীদের দ্বারে আশ্রয় নিয়েই জীবন বাঁচান কট্টর ভারত ও রাশিয়া পন্থীরা। শেখ নাসের বেঁচে থাকলে তিনিও বলতে পারতেন। তিনি আমার বাড়ীতে ৩৫ দিন পর্যন্ত লুকিয়ে ছিলেন। ছিলেন ভারতে পালাবার নিরাপদ পথের খবর ও সময়ের অপেক্ষায়।

দু'এক জন সুযোগধারী ছাড়া কোন ঈমানদার লোককে আমি ঘাতক হিসাবে দেখিনি বরং দেখেছি তার বিপরীত। দেখেছি বহু হিন্দুদেরকেও ইসলাম পন্থীরা তেমনভাবে পাহারা দিয়েছে যেমনভাবে মুরগী তার বাচ্চাদেরকে পাহারা দেয়। যদি কেউ প্রমাণ চান তবে আসুন আমার এলাকায় আওয়ামী লীগ নেতা, ন্যাপ নেতা ও হিন্দু নেতাদের বাড়ীতে নিয়ে যাব এবং তাদের মুখ দিয়ে শুনাব।

প্রশ্ন ঃ আপনার এক সময়ের আশ্রিত শেখ নাসের সম্পর্কে অনেক গুজব শোনা যায়। যশোর ও খুলনা সীমান্ত নাকি তার জন্য উন্মুক্ত ছিল? এ বিষয়ে আপনার কিছু জানা আছে কি?

উত্তর ঃ আমিও লোক মুখে শেখ নাসের সম্পর্কে অনেক কথাই শুনেছি। এই ছোট শেখ সাহেবই অর্থাৎ শেখ নাসের সাহেব সম্পর্কে বেনাপোলে একটা গল্প শোনা যায়। গল্পটা যেমন দুঃখজনক তেমনি গর্বেরও।

গল্পটা হচ্ছে এই যে, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর একবার এক পাট বোঝাই মাল গাড়ী ট্রেন বেনাপোলের বি, ডি আর পুলিশ আটক দেয়। পরে পুলিশদের বলা হলো এতে শেখ নাসের সাহেবের পাট বোঝাই রয়েছে কাজেই গাড়ীটা ছেড়ে দিন। লোকে বলে ওখানকার বি, ডি, আর কর্মকর্তা বললেন, নাসের সাহেব কেন খোদ শেখ সাহেবের পাট হলেও আমি ছাড়বো না। এরপরও

islamirenesaandolon.blogspot.com

যখন ছেড়ে দিতে অনুরোধ করা হয় তখন বি, ডি আর কর্মকর্তা বললেন, এ গাড়ী ভারতে গেলে আমার জীবন থাকা অবস্থায় যাবে না, গেলে আমার লাশের উপর দিয়ে যেতে পারে।

এরপর বেচারা বি, ডি, আর কর্মকর্তাকে গুলি করে হত্যা করে পরে গাড়ী ভারতে নিয়ে যায়। এ গল্পটা বেনাপোলে শোনা যায়। এটা একই সঙ্গে যেমন দুঃখজনক খবর তেমন আমাদের বি, ডি, আর জওয়ানদের জন্য গর্বেরও কারণ বটে। কারণ তাদের লাশের উপর দিয়েই এ দেশের মাল বিদেশে গিয়েছে; জীবিত থাকতে যেতে দেয়নি।

প্রশ্ন ঃ বলা হয়ে থাকে যারা রাজাকার ছিল তারা সবাই ছিল জামায়াতী বা মুসলিম লিগের ছেলে। এটা কি ঠিক?

উত্তরঃ এ প্রশ্নের জবাব ইতিপূর্বে বিস্তারিত দিয়েছি। তবু সংক্ষেপে বলছি যে, এ ধারণা আদৌ ঠিক নয়। ঠিক নয় এই জন্যে যে , আমি যে জেলার লোক সেই জেলার ৩৭ টি ইউনিয়ন থেকে জামায়াত আর মুসলিম লীগ মিলে ৭০ এর নির্বাচনে ভোট পেয়েছিল এক শতের কাছাকাছি আর সেখানে রাজাকারের সংখ্যা ছিল ১১ হাজার। এরা কারা ছিল, তা কি কাউকে ব্যাখ্যা করে বুঝানো লাগে? যারা ছিল সুযোগ সন্ধানী তারা সুযোগ পেয়েছে ব্যাস, রাজাকার হয়ে পড়েছে আবার যখনই রাজাকারদের পতন ঘটেছে তখন রাজাকাররা দলে দলে মুক্তিফৌজে ঢুকে পড়েছে। কাজেই পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা আছে। কিন্তু পঙ্গু রাজাকার নেই। এর অর্থ হল ঐ পঙ্গু রাজাকাররা এখন সবাই পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধা।

এছাড়া আমার কিছু গ্রামের খবর জানা আছে যেখানে ৭১-এর ত্রিমুখী বিপর্যয়ের হাত থেকে বাচাঁর জন্যে গ্রামে মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে আমাদের কিছু ছেলে রাজাকার আর কিছু ছেলে মুক্তিফৌজে দিতে হবে। উদাহরণ স্বরূপ বলতে পারি, আমাদের ইউনিয়ন বড়শলোই ও কলোইভাঙ্গা গ্রামের প্রধানগণ মিটিং করে সিদ্ধান্ত নেন যে, দুই দিকেই ছেলেদের ভাগ করে দিয়ে বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে। এই সিদ্ধান্ত মুতাবিক যে গ্রামের শতকরা ১০০ জন লোকই ছিল নৌকার ভোটার তাদেরই বেশ কিছু সংখ্যাক ছেলেদের দেয় রাজাকারে। যেমন কলোইভাঙ্গা গ্রামের একই মায়ের দুই ছেলে- সাদেক আহমদ যায় রাজাকারে আর তার ছোট ভাই ইজহার যায় মুক্তিফৌজে। তাদের মুখেই শুনেছি, তারা দেশ রক্ষার কাজে ব্যস্ত ছিল না; ব্যস্ত ছিল গ্রাম বাঁচানোর কাজে। এইটাই ছিল অধিকাংশ গ্রামের অবস্থা। আর এইটাই ছিল রাজাকারদের পরিচিতি।

islamirenesaandolon.blogspot.com

প্রশ্ন ঃ তাহলে প্রকৃত রাজাকার কারা ছিল?

উত্তর ঃ এর বেশীর ভাগ ছিল আওয়ামী লীগ আর ছিল চোর ডাকাত। আর কিছু ছিল ইসলাম পন্থী।

প্রশ্ন ঃ অধ্যাপক গোলাম আযমের মূল অপরাধ কি?

উত্তর ঃ অধ্যাপক গোলাম আযমের মূল অপরাধটা জানতে হলে ফিরে যেতে হবে একেবার গোড়ার ইতিহাসে। কাবিলের কুরবানী আল্লাহ কবুল করলেন না। হাবিলের কুরবানী আল্লাহ কবুল করলেন। তাই কাবিলের ঈর্ষা হলো যে হাবিলকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেব যেন আমার মুকাবেলায় হাবিল ভাল মানুষ হিসাবে চিহ্নিত হতে না পারে। তাই ইর্ষায় হাবিলকে হত্যা করল।

আরবের শ্রেষ্ট কবি ইমরুল কায়েসকেও হত্যা করেছিল তার চাইতে ছোট করিরা। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ইমরুল কায়েস বেঁচে থাকা পর্যন্ত তারা বড় কবির মর্যাদা পাবে না।

ঐ একই কারণে যখন কাবিলের আওলাদেরা দেখল যে যার ৭১ বছর বয়সের জীবনে কোন থানায় তার নামে একটা জি, ডি পর্যন্ত নেই। সে লোক সৎ লোক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে, তা আমি সহ্য করব কি করে। তাই তাকে গণআদালত বসিয়েই হোক আর যেভাবেই হোক শেষ করতে হবে।

একারণেই ৭১ এর সব দোষ চাপান হয় অধ্যাপক গোলাম আযম ও তার দলের লোকদের ঘাড়ে, যেন ভাল লোক গুলোকে ময়দান থেকে সরিয়ে দিয়ে আমরাই ভাল মানুষ সাজতে পারি।

এ নিয়ম তো প্রথম মানুষটির আওলাদ থেকেই চালু রয়েছে। কাজেই গোলাম আযমের ঘাড়ে এরূপ কিছু দোষ চাপান হবে, এটা নুতন কিছু নয়। পারলে কোর্টে তার দোষ প্রমাণ করুক।

প্রশ্ন ঃ ৪৭ এ ভারত ভাগ হয় কোন চেতনার ভিত্তিতে এবং ভারত ভাগ করতে গিয়েও কি রক্ত ঝরাতে হয়েছে।

উত্তর ঃ আমি পূর্বেই বলেছি মুসলমানদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে অখন্ড ভারতের সংখ্যা গুরু সম্প্রদায় হিন্দুদের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে ছিল এমন গরমিল যেমন গরমিল রাত ও দিনের মধ্যে। মুসলমানদের ওরা কি নজরে দেখত তা তো একবার বলেছিই। এর পরও বলব মুসলমানরা তাদের ধর্ম নিয়ে স্বাধীন মানুষের মর্যাদা সহকারে বেঁচে থাকার ও জীবন যাপনের জন্যে

islamirenesaandolon.blogspot.com

সংগ্রাম করেছে ৯ মাস নয়, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। রক্ত দিয়েছে অজস্র। মা বোনের ইজ্জত হরণ করেছে কেমন ভাবে তা না যায় মুখে বলা আর না যায় কলমে লেখা।

ভারতের মত একটা দেশকে ভাগ করা সহজ কথা? তখন সারা পৃথিবীতে পাকিস্তান আন্দোলনের চাইতে বড় ধরনের আর কোন আন্দোলন ছিলনা। সারা পৃথিবীর নজর ছিল ভারতের দিকে।

এরপর যখন ভারতীয় হিন্দু নেতারা দেখলেন যে আন্দোলন করে দেশ ভাগ ঠেকান যাবে না, এর জন্যে দরকার মুসলমান নিধন অভিযান চালান, তখন হটাৎ একদিন দিল্লীতে হিন্দুরা ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানদের উপর। শুরু হলো হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা। এই দাঙ্গার নাম দেয়া হয়েছিল হিন্দু মুসলমানের রায়োট। সব চাইতে বড় রায়োট হয় দিল্লীতে। যার নাম ছিল ৪৬ এর দিল্লী রায়োট।

আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, ইতিহাসের অনেক কিছুই লেখা হয় কিন্তু লেখা হলো না সেই ৪৬ এর হিন্দু মুসলমান রায়োটের কথা। কাজেই আজ ভাবতে বাধ্য হচ্ছি, আমরা চোখে দেখা লোকগুলো যখন দুনিয়া থেকে চলে যাব তখন এই হৃদয়বিদারক ইতিহাসও আমাদের সঙ্গে কবরস্থান হয়ে যাবে।

৪৬-এর রায়োটের পর যে সব মুসলিম পরিবারের ২/১ টা ছেলে বেঁচে ছিল তাদেরকে মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দী দিল্লী থেকে রিজার্ভ ট্রেনে করে এনে কলকাতার এতিমখানায় রাখেন। সেখানেও তাদের স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। তখন কলকাতার অনেক মুসলমান সে সব এতিম ছেলেদের নিয়ে নিজেদের পরিবার ভুক্ত করে নেয়। তার একটা ছেলে কাসেম নামের (৬ বছরের) তাকে আমিও নিয়ে আসি আমার পরিবারে তখন আমাদের সংসার প্রায় ছিলই না।

৪৫ সালে মা মারা যান। আমরা ৪ ভাই আর আব্বা ছাড়া সংসার চালানোর মত কেউ না থাকায় ঐ কাসেমকে বাধ্য হই আমার শ্বশুর বাড়ি রেখে মানুষ করতে। তখন আমার স্ত্রীর বয়স ছিল ১০ বছর। সে তখন ছোট হওয়ার কারণে পিত্রালয়েই থাকত। সেখানেই কাসেমকে রাখতে বাধ্য হই। পরে সেই কাসেমের আমিই পিতা আর ১০ বছরের মেয়ে হয় তার মা। এভাবে কাসেম আমার বড় ছেলে বলে পরিচিতি লাভ করে। যদিও তার আসল পিতা মাতা দিল্লীর অধিবাসী এবং তারা ৪৬-এর রায়োটে শাহাদাত বরণ করেন। যদিও ৪ বছর পূর্বে কাসেম দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে গেছে

islamirenesaandolon.blogspot.com

কিন্তু ৪৬-এর জ্বলজ্যান্ত সাক্ষী হিসাবে বাংলাদেশকে উপহার দিয়ে গেছে ৫ টি পুত্র সন্তান।

কাসেম তার ৬ বছর কচিমুখে যেটুকু বর্ণনা দিতে পারত ৪৬-এর মুসলিম নিধনের কথা, তাতে এমন কোন নিষ্ঠুর বান্দা ছিলনা যার চোখ দিয়ে পানি ঝরেনি।

এর পরদিন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যখন এই এতিমদের নিয়ে কলকাতায় আসেন, সেদিন আমি মরহুম শাহ আজিজুর রহমান ও আরো কয়েকজন মুসলিম লীগ কর্মী ছিলাম কলকাতায় ১ নং হগ মার্কেট মাওঃ আকরাম সাহেবের বাসায়। সোহরাওয়ার্দী সাহেব এসে কিছু নেতৃস্থানীয় মুসলিম নেতাদের ডেকে বললেন "তোমরা যদি শক্তি প্রয়োগের মহড়া দিয়ে প্রমাণ করতে পার যে ভারতে মুসলিম শক্তিও একটা শক্তি তবে ধর্ম নিয়ে বেঁচে থাকার জন্যে দেশকে ভাগ করে নিতে পারবে, নইলে দেশ ভাগ করতে পারবে না।

কারণ হিন্দুরা মনে করে ভারতকে ভারত মাতার। তাদের বিশ্বাস মুতাবিক মনে করে ভারতকে ত্রিখন্ডিত করার অর্থই নিজের মাকে নিজের সামনে ত্রিখন্ডিত হতে দেয়া। এটা আমরা কি করে সহ্য করব। তাই তারা মরিয়া হয়ে ক্ষেপে ছিল শক্তির দ্বারা মুসলমানদের নির্মূল করার কাজে। কিন্তু জনাব মরহুম শহীদ সোহরাওয়ার্দীর হুকুমে কলকাতায় মুসলমানরা ঝাঁপিয়ে পড়ল দিল্লী রায়োটের পাল্টা রায়োটে। কলকাতায় মুসলমানরা মাত্র ২ ঘন্টার মধ্যে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে ৩০ কোটি হিন্দুর মুকাবেলায় ভারতের ১০ কোটি মুসলমানদের মুসলিম শক্তি ও একটা বিরাট শক্তি।

এরপরই সারা ভারতের মুসলমানদের কাছ থেকে ভোটের মাধ্যমে ম্যান্ডেট চাওয়া হয় যে মুসলমানরা ভারত ভাগ করে একটা মুসলিম রাষ্ট্র চায় কিনা। তাতে সারা ভারতের ৯৮% মুসলমান ভোট দিয়েছিল ভারত ভাঙ্গার পক্ষে। এর পরই ভারত বিভক্ত হয়। এতে শুধু মুসলমানদের রক্ত দিতে হয়নি, হয়েছে মা বোনের ইজ্জত দিতেও। যা চোখের ফিল্মে এখনও বহাল তবীয়তে টিকে আছে। মনে হয় আমাদের মত বৃদ্ধদের চোখ যখন কবরে যাবে তখন এ ইতিহাসও কবরে চলে যাবে।

তবে দেশের অধার্মিকদের মনে রাখতে হবে ১৯০৫ সালের বর্ডার আর ৪৭ এর বর্ডার এক নয়। শেখ হাছিনাকে বলব, আপনার পিতার ও আমার জন্ম হয় একই সনে, তিনিও এসব চোখে দেখেছেন, এবং আমার মতই

islamirenesaandolon.blogspot.com

জানতেন যে ৪৭ এর বর্ডার তৈরী হয়েছে মুসলমানদের রক্তের সিমেন্ট দিয়ে পাকা মজবুত ভিত্তির উপর। কাজেই ১৯৪৭ সালের অবস্থা আর ফিরে আসবে না। তাই তিনিও পাকপন্থী ছিলেন এ কথাকে সূর্যের আলোর মতো সত্য হিসাবে মেনে নিতে হবে।

আর যারা ইসলাম ধর্মকে সত্য বলতে পারবে না তারা অধর্মের দেশে চলে যেতে পারেন। এ দেশে তাদের স্থান হবে না। নিশ্চয়ই ভারতীয় দালালদের খুঁটির জোর এ ম্যান্ডেটরী দেশে খাটবে না।

চিন্তা করুন, কাশ্মীর ঝাড়খন্ড, এখনও তো স্বাধীন হতে পারছে না। আর মুখের ফুতে কি ভারত ত্রিখন্ডিত হয়েছিল ? তা হয়নি।

এ দেশ ধর্মীয় মুসলমানদের রক্তের ভিত্তির উপর গড়ে ওঠা একটা দেশ। কাজেই এ দেশ নিয়ে ছিনিমিনি খেলা সময় থাকতেই বন্ধ হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ বলা হয়ে থাকে এ দেশের ইসলামপন্থীগণ ছিলেন স্বাধীনতার শত্রু। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ দুনিয়ার কোন মানব সন্তানই স্বাধীনতা বিরোধী হতে পারে না। তবে একজনের মুকাবেলায় অপরজন আদর্শ বিরোধী হতে পারে। আসলে হয়েছেও তাই। কেউ চেয়েছিলেন এদেশকে ভারতের মুরব্বিয়ানায় ছেড়ে দিতে আর কেউ তা চাননি। পার্থক্য শুধু এই খানেই। তখন ভারত পন্থীরা কি চেয়েছিলেন তার সঠিক তথ্য স্বাধীনতার প্রায় দেড়যুগ পরে ভারতের সাবেক প্রেসিডেন্টের মুখ দিয়ে ফাঁস হয়ে পড়েছে।

পড়ে দেখুন গত ৩১-৭-৮৭ তারিখের ইনকিলাবের সম্পাদকীয় কলাম। দেখুন এটা পড়ার পর কি বুঝতে বাকী থাকার কথা যে , ইসলাম পন্থীগণ কোন ধরনের স্বাধীনতার শত্রু। বিশেষ করে ঐ সময়ের লন্ডন টাইমস এ দেশের এক শ্রেণীর লোকদের দালাল ও স্বাধীনতার শত্রু বলার বিরোধীতা করেছে। টাইমস বলেছে বাংলাদেশের কেউ দালাল বা স্বাধীনতার শত্রু নয়। তারা কি গাঁজাখোর ছিল?

প্রশ্ন ঃ বলা হয়ে থাকে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে এক সাগর রক্ত দিতে হয়েছে এবং বলা হয় অন্য কোন জাতিকেই স্বাধীন হতে এত রক্ত দিতে হয়নি। এ কথা কতটুকু যথার্থ।

উত্তর ঃ দেখুন যা বলা হয় তা একেবারে মিথ্যা নয়। ২৫শে মার্চের মধ্যে রাত হতে একটানা তিন দিন বর্বর পাক বাহিনীর হামলার মুখে অনেক

islamirenesaandolon.blogspot.com

বাঙ্গালীর রক্ত দিতে হয়েছে। আর রক্ত দিয়েছে কিছু প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা। এদের সংখ্যা যত বাড়িয়ে বলা হয় আসলে তার এক শতাংশও নয়। আর অন্যদের বেলায় কথাটা একটু ঘুরিয়ে বলা হয়। আসলে তাদের রক্ত দিতে হয়েছে কোথায়? এ দেশের যারা আওয়ামী লীগের এম, পি এ ছিলেন তারা কে কয় ফোটা রক্ত দিয়েছেন। তাদের পরিবারের লোকগুলোকে তো তখন তাদের শত্রুদের মধ্যে রেখেই তারা ভারতে গিয়েছিলেন, বলুন তাদের পরিবারের কয়জন লোক কয় ফোটা রক্ত দিয়েছেন?

রাসূল (সঃ) যে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন তাতে যেমন রক্ত ঝরিয়েছিলেন নবী (সঃ) নিজেই, তেমন রক্ত ঝরিয়েছে বিরোধীদলের বড় নেতা আবু জেহেলও। দেখাতে পারবেন এইরূপ কোন নেতা কয় ফোটা রক্ত দিয়েছেন। যারা রক্ত দিয়েছে তারা তো আসলে রক্ত দেয়নি, বরং ক্ষমতা হাতে পেয়ে তাদের রক্ত জোর করে কেড়ে নেয়া হয়েছে।

রক্ত নেয়া শুরু হয়েছে বিহারীদের থেকে। বলুন এরা কি রক্ত দিয়েছে না, এদের রক্ত নেয়া হয়েছে। আর 'জয় বাংলা' না বলার কারণে যাদেরকে পা উপরের দিকে দিয়ে ঝুলিয়ে ব্লেড দিয়ে কেটে রক্ত ঝরান হয়েছে তারা কি এ দেশকে স্বাধীন করার জন্যে পাক বাহিনীর হাতে রক্ত দিয়েছে নাকি দেশকে স্বাধীন করার পর জয় বাংলা না বলার কারণে তাদের রক্ত নেয়া হয়েছে।

প্রকৃত সত্য হচ্ছে এই যে, রক্ত নেয়া হয়েছে বেশী দেয়া হয়েছে খুবই কম। এ কথা এক দিন দেশের কোটি কোটি লোকের মুখ দিয়ে বেরুবে প্রয়োজন আরো কিছু সময় মাত্র।

প্রশ্ন ঃ জয় বাংলা না বলার কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছে তাদের দু'চার জনের নাম বলতে পারবেন কি?

উত্তর ঃ হ্যাঁ যা শুনেছি এবং যতদূর মনে আছে বলতে পারব ইনশাআল্লাহ। শুনেছি নেত্রকোনার বারহাট্টার এক দারোগা সাহেবকে মারা হয়েছে শুধু জয় বাংলা না বলার অপরাধে।

শুনেছি ভোলার মাওলানা হাকিম আঃ মান্নান সাহেবকে ঘর থেকে টেনে বের করে নিয়ে জয় বাংলা বলতে বলা হয় তিনি তা বলেননি। এই অপরাধে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

শুনেছি মনোহরদী উপজেলার বেলতলা ইউনিয়নের নোয়াকান্দি গ্রামের মাওলানা হাজী আজিমুদ্দিন সাহেবকে 'জয় বাংলা' না বলার কারণে পা উপরে

islamirenesaandolon.blogspot.com

দিকে দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে শরীরটাকে অস্ত্র দ্বারা ক্ষতবিক্ষত করে দেয়, তারপর চোখ উপড়ে ফেলে। শুনেছি মুলাদি থানার মাওঃ আঃ মজিদ সাহেবকে জয় বাংলা না বলার কারণে গুলি করে মারা হয়।

শুনেছি হবিগঞ্জের অধীন খরকি গ্রামের মাওঃ শরীফুদ্দিন সাহেবের এক জামাইকে- যিনি একজন আলেম ছিলেন-জয় বাংলা না বলার কারণে হত্যা করা হয়। শুনেছি চরফ্যাশনের আমিনবাদ ইউনিয়নের শিবা গ্রাম নিবাসী দুইজন প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা জনাব মহিবুল হক মিয়া ও চৌধুরী মিয়াকে ধরে নিয়ে জয় বাংলা না বলার কারণে মেরে ফেলা হয়।

একই অপরাধের অজুহাতে মারে বহু ঈমানদার লোকদেরকে। শুনেছি বেগমগঞ্জ উপজেলার দুইজন হাফেজকে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়। মাইজদীতে একজনকে জ্যান্ত কবর দিয়ে চলে যাওয়ার পর তার কবর থেকে আল্লাহ আল্লাহ যেকের শোনার পর অন্যেরা কবর থেকে তাকে জীবন্ত উদ্ধার করেছে।

এভাবে বললে বইয়ের কলেবর বৃদ্ধি পাবে। আপনি যে এলাকার লোকই হন না কেন মনে মনে হিসাব করে দেখুন আপনার জানা এলাকার মধ্যে কি ঘটেছে এবং কাদের দ্বারা ঘটেছে।। তাহলেই বুঝবেন সঠিক কোনটা আপনার আশে- পাশে যাকে পাবেন জিজ্ঞেস করুন, লোক কারা কিভাবে মরেছে, কোন গ্রাম থেকে ক'টা মরেছে। কারা কিভাবে মারল, এসব জিজ্ঞেস করলে আপনার পার্শ্বের লোকই এর ভাল জবাব দিতে পারবেন এবং জানতে পারবেন জয় বাংলা না বলার কারণে কত গণ্যমান্য লোককে মেরে ফেলা হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ "৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে।" এই সংখ্যাটা কিসের ভিত্তিতে বলা হয়?

উত্তর ঃ আমার যতদূর মনে পড়ে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ১০-১-৭২ তারিখে দেশে ফিরেই এক ভাষণে বলেন এ দেশের ২ লাখ ৭৬ হাজার লোক জীবন দিয়েছে। তার সংখ্যাটাও ছিল দলীয় লোকদের কাছ থেকে শোনা। এটা স্বরাষ্টমন্ত্রণালয়ের হিসাব ছিলনা। পরে ঐ দিনই কিছু বিদেশী সাংবাদিক তার সঙ্গে দেখা করেন। শুনেছি রাশিয়ার সংবাদসংস্থা প্রাভদা ও ইজভেসতিয়ার প্রতিনিধি দুই জন সাংবাদিক এসে দেখা করে শেখ সাহেবকে বলেন, স্যার, আপনার দেশের ৩০ লাখ মানুষ এ যুদ্ধে জীবন দিয়েছে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

ব্যাস এই সংখ্যাটি শেখ সাহেব মেনে নিলেন। এরপর ঐদিনই (১০ই জানুয়ারী ১৯৭২) রাতের বেলায় এক রেড়িও ভাষণে বললেন এ দেশের ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে। কিন্তু জনাব মুহাইমেন সাহেব বলেছেন তিনি (শেখ সাহেব) তিন লাখ বলতে গিয়ে ভুলবশতঃ ৩০লাখ বলে ফেলেছেন। এর যে কোন একটা সত্য হবে। এইভাবেই সংখ্যাটা ৩০ লাখ হয়েছে বলে আমার জানা।

তবে এ সংখ্যাটা কিন্তু স্বরাষ্ট মন্ত্রণালয়ের হিসাব নয়, আর যেহেতু এটা শেখ সাহেব মুখ দিয়ে বলে ফেলেছেন তাই এটাকে বেঠিক হিসাব বলার মত সাহস তখন কারোরই ছিলনা। আমার জানা মতে, গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে ১টি করে লোক মরেছে বলেও সন্দেহ হয়। আমি যতদুর খবর রাখি তার থেকে বলছি তবে এর সঠিক সংখ্যা পাওয়া এখনও মোটেই কোন কষ্টকর ব্যাপার নয়। আজও প্রতি গ্রামে এমন বহু লোক রয়েছে যাদের বয়স ২৫/৩০ এর বেশি। তখনকার ঘটনা এদের প্রত্যেকেই সচক্ষে দেখেছেন।

আর যাদের নিজেদের লোক মরেছে তাদের বয়স ১০/১২ বছর হলেও তারা শুনেছে যে কারও ভাই মরেছে,কারও পিতা,কারও চাচা মরেছে, কারও দাদা মরেছে, কারও ছেলে মরেছে। কাজেই ঘটনার সঠিক হিসাব পাওয়া মোটেই দুঃসাধ্য ব্যাপার নয় এখনই যদি প্রতি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে বলা হয় ৭১ এর শহীদদের নাম ঠিকানাসহ একটা হিসাব তৈরী করে দিতে তাহলে ২ সপ্তাহ সময় লাগবে না। এর সঠিক হিসাব আসতে। কিন্তু তা করবে না কোন সরকারই। কারণ এর মধ্যে কিছু স্বার্থ আছে গোটা দেশের আর কিছু স্বার্থ আছে একটা বিশেষ গোষ্ঠীর।

প্রশ্ন ঃ অনেক বেশি করে দেখানো কিংবা এর সঠিক হিসাব সংগ্রহ না করার মধ্যে কি স্বার্থ আছে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ অনেক স্বার্থ আছে তাদের যারা-এ দেশ থেকে ইসলাম নামটাকে উৎখাত করতে না চাইলেও সঠিক ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের উৎখাত করতে চায়। তাদের স্বার্থ হচ্ছে এই যেমন-ঃ

১. সারা দুনিয়াকে দেখান যে, এ দেশের ইসলাম পন্থীরা এত নিষ্ঠুর নির্দায় যার কোন নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে নেই। এরা মানুষ নয়, এরা মানুষ নামের হিংস্র জানোয়ার। এদের দ্বারা কোন দিনই জনগণের কল্যাণমুলক কাজ হতে পারে না। কাজেই এদের কথায় যেন কেউ কান না দেয় । এইটাই তাদের কুমতলব।

islamirenesaandolon.blogspot.com

২. '৭১-এর ঘটনা স্বচক্ষে দেখার লোক যখন বেঁচে থাকবেনা। তখনকার লোক এই সংখ্যাটাকে সঠিক মনে করবে এবং তারা বুঝবে যে ইসলাম পন্থীরা আসলে হিংস্র ঘাতক যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্রও মানবতাবোধ নেই। কাজেই, আর ২০ বছর পর যখন ইসলাম পন্থীরা ইসলামের কথা বলতে চাইবে তখন যেন নতুন প্রজন্মের লোকেরা বলতে পারে যে, থাম, ভুতের মুখে রাম নাম শোভা পায় না। এটা হলো তাদের সুদূর প্রসারী কুমতলব।

৩. সারা দুনিয়াকে এটা দেখানো যে, এ দেশের লোক ইসলামকে পছন্দ করে না। কাজেই ইসলামের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে যে দেশের ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছে সে দেশে আর ইসলাম চলতে দেয়া যেতে পারে না। তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম ছাটাইয়ের অভিযান শুরু হয়ে যায়।

৪. লোক হত্যার ব্যাপারে ইসলাম পন্থীদেরই শ্রেষ্ঠ করে দেখান। আর এ ব্যাপারে প্রথম হিসাবে যদি ইসলাম পন্থীদেরকে চিহ্নিত করা যায় তাহলে নাস্তিকদের স্থানটাকে ২য় বা ৩য় তে আনতে পারে। আর তা পারলেই তাদের কুমতলব হাসিল হতে পারে । এ জন্যে সংখ্যাটা বুঝে সুঝে উপযুক্ত স্থান থেকেই এসেছে এবং তাদের কুমতলব হাসিল হতে পারে এমন একটা সংখ্যাই তারা বলেছে।

প্রশ্ন ঃ '৭১-এর যুদ্ধে পাক সেনাদের পরাজয়ের কারণ সম্পর্কে আপনি কি মনে করেন?

উত্তর ঃ ১. পরাজয়ের যেসব কারণ ছিল তার মধ্যে প্রধান ছিল-যুদ্ধের পলিসি নির্ধারিত হয়েছিল আনাড়িদের হাতে। অর্থাৎ রাজনৈতিক ব্যক্তিদের হাতে পলিসি নির্ধারিত হয়নি। হয়েছে সামরিক বিভাগের হাতে। যারা যুদ্ধের ব্যাপারে যোগ্য হলেও রাজনীতির ক্ষেত্রে ছিল অযোগ্য। অপর দিকে প্রতিপক্ষের পলিসি নির্ধারিত হয়েছে অভিজ্ঞ ও ঝানু রাজনীতিবিদদের হাতে।

২. তারা আর যে বড় ভুল করেছে তা হচ্ছে এই যে, তারা দেশের লোকদের উপর হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন চালিয়ে তাদেরকে শত্রু বানিয়ে ছিল এবং দেশের সমর্থন হারিয়ে ফেলেছিল।

৩. আরও ভুল করে বাংলা ভাষা না বুঝার কারণে। শুনেছে এক রকম আর বুঝেছে অন্য রকম। যার নাম শুনেছে রাজ বিহারী মন্ডল তাকে মনে করেছে সে একজন বিহারী। আর যারা ইসলামপন্থী ছিলেন তাদেরকে মনে

islamirenesaandolon.blogspot.com

করেছে নৌকার ভোটার। তারা যখন গ্রামে ঢুকেছে তখন যারা ছিল নৌকার ভোটার তারা পালিয়ে গেছে আর যারা ছিল দাড়ি পাল্লার ভোটার তারা পালায়নি। পাক সেনারা তাদেরকে ধরে মারার ব্যাপারটা উদাহরণ দিয়ে বুঝাচ্ছি।

মাগুরার মোহাম্মদপুর থানার নারানদিয়া গ্রামের একটা পরিবার ছিল জামায়াত পন্থী। পাক সেনারা খোঁজ নিয়ে সেই বাড়ীতে উঠেছে। সেখানে থেকে তারা ডাল-ভাত খেয়েছে। মজার ব্যাপার হলো এই যে, স্থানীয় কিছু হিন্দু পরিবার জামায়াতে ইসলামির লোকদেরকে আমানতদার মনে করত। তারা তাদের সোনার গহনা-গাট্রা ঐ জামায়াতীর বাড়ীতে গচ্ছিত রেখেছিল। ঐ বাড়ীর মাহবুব মিয়া মনে করল যদি পাক সেনারা বাড়ী তল্লাসী করে পরের মাল নিয়ে যায় তাহলে কি কৈফিয়ত দেব।

এইটা মনে করে গহনার পুটলিটা পাশের বাড়ী রেখে আসার জন্যে সৈনিকদের চোখ এড়িয়ে দৌড়ে পাশের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। কিন্তু পাক সেনাদের কেউ দেখে ফেলে। পরে তারা ঐ বাড়ী ঘেরাও করে মাহবুবকে এবং সেই বাড়ীর আরেকটা যুবক ছেলেকে ধরে এনে গাছের সাথে বেঁধে গুলী করে মারে।

এভাবে আদর্শগত দিক থেকে যারা পাকপন্থী ছিল তাদেরকেও ওরা শত্রু বনিয়ে ফেলে। শেষ পর্যন্ত অনেক পুলিশ অফিসার যারা পাকিস্তানের পক্ষে জীবন দেয়ার জন্যে মনের দিক থেকে প্রস্তুত ছিলেন তাদেরকেও ধরে ধরে মারতে লাগল। অনেক দায়িত্বশীল অফিসার পাকপন্থী ছিলেন তাদেরকে মুক্তিফৌজের সহায়তাকারী মনে করে মারতে লাগল।

এতে দেশের সর্ব শ্রেণীর জনগণ তাদের উপর ক্ষেপে যায়। অতঃপর দেশের লোক তাদের বিপক্ষে চলে যায়। ফলে এ দেশে তারা সাহয্যকারী ও সমর্থনকারী হারিয়ে ফেলে। এটা ছিল তাদের রাজনৈতিক অদুরদৃশ্যর্তার ফল। তারা যখন দেখল যে তারা কোথায়ও গিয়ে আর ফিরে আসতে পারে না। যাওয়ার সময় যে ব্রীজের উপর দিয়ে যায় ফেরার সময় দেখে তা ভাঙ্গা। শেষে ওরা যখন বুঝল যে দেশের লোক তাদের বিরুদ্ধে চলে গেছে তখনই তারা সালেন্ডার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

৪. তারা আরও একটা কাজ করে আল্লাহর সাহায্য হতে বঞ্চিত হয়। তাদের কিছু জওয়ান নারীদের উপর পাশবিক নির্যাতন চালায় যা তাদের উর্ধতন ভাল অফিসারগণও রোধ করতে পারেনি। এমন কি তাদের অনেক

islamirenesaandolon.blogspot.com

দায়িত্বশীল অফিসার ও নারী নির্যাতনের মত জঘন্য অপরাধ করেছে। এর কারণে যেমন দেশের গণ মানুষ তাদের উপর ক্ষ্যাপা ছিল তেমন আল্লাহ ছিলেন তাদের উপর নারাজ। এই ধরনের বিভিন্ন ভুলের জন্যে তারেকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। পক্ষান্তরে ঐ সময় আল্লাহ ইসলাম পন্থীদেরকেই গায়েবী মদদ যুগিয়েছেন তা হয়ত অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই উপলব্ধি করেছেন।

প্রশ্ন ঃ ইসলাম পন্থীরা কিভাবে আল্লাহর গায়েবী মদদ পেল বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ অতি সম্প্রতি এমন কতগুলো তথ্য ফাঁস হয়ে পড়েছে যা সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝা যাবে আল্লাহ আমাদের কতভাবে গায়েবী সাহায্য করেছেন।

জাতীয় দলের প্রধান আমেনা বেগম অতি সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'রাজনীতি ছিল শেখ মুজিবের ব্যবসা।' একটা সাপ্তাহিকীতে প্রকাশিত একই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছেন তার কাছে প্রমাণ আছে ১৫ই আগষ্ট ৭৫ ভারতীয় সেনাবাহিনীর ৪টি হেলিকপ্টার ৪ জন ভারতীয় জেনারেলকে নিয়ে গোপনে বাংলাদেশে এসেছিল। মুজিবকে ভারতীয়দের ভাষায় কিডনাফ করে দিল্লীতে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তারা বাংলাদেশে এসেছিল। ভারতীয়রা মুজিবকে পরিকল্পিত নব্য অঙ্গরাজ্য বাংলাদেশের আমরণ মুখ্যমন্ত্রী এবং ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে ঘোষণা দেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছিল। এ জন্যে ১০ হাজার ভারতীয় পতাকাও এখানে আনা হয়েছিল। তাদের এই পরিকল্পনা বানচাল করার জন্যে এ দেশের কেউই পরিকল্পিত কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। ঘটনাচক্রে এমন কিছু ঘটে গেছে যাতে তাদের সে পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। এইটাকে বলে আল্লাহর গায়েবী মদদ।

এছাড়া ভারতীয় সৈন্য ফেরত নেয়া ভুল হয়েছে বলে সম্প্রতি ভারতের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জৈলসিংহ তার বিদায়ী ভাষণে মন্তব্য করেছেন যে, বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা ঠিক হয়নি। আসলে আল্লাহ এমন কিছ পারিপার্শ্বিক ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন যাতে ভারতীয়রা ইচ্ছা না থাকলেও বাধ্য হয়েছিল সৈন্য প্রত্যহার করতে। যেমনঃ-

১. পাক বাহিনীর সালেন্ডারের পূর্বেই ভারতীয়দের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া। এটা কিভাবে হয়েছে তা অনেকেরই জানা আছে। ঐ সময় পাকিস্তান

islamirenesaandolon.blogspot.com

কে সাহায্য করার জন্যে আমেরিকান সপ্তম নৌ-বহর যখন বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হতে থাকে তখন অবস্থা বেগতিক দেখে ৩ দিনের সফরে রাশিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভারতে এসে বেশ কয়েকদিন রয়ে গেলেন। তারপর ভারতীয় রেডিও থেকে শুধু পাক সেনাদের প্রতি আত্মসমর্পনের আহবান জানান হচ্ছিল।

রাশিয়ানরা দেখছিল যে যদি আমেরিকানরা একটা মিসাইল ছেড়েই বসে তাহলে তার পাল্টা জবাব তো আমাদেরই দেয়া লাগবে অথচ রাশিয়ানরা কখনও সরাসরি আমেরিকার মুকাবেলা করার সাহস রাখে না। ফলে শুধু বলা হচ্ছিল যে, পাক বাহিনী সালেন্ডার কর। এদিকে রাও ফরমান আলী তার অভ্যন্তরীন অবস্থা টালমাটাল দেখে ১০ই ডিসেম্বর জাতিসংঘে সরাসরি সালেন্ডারের প্রস্তাব দিয়ে দেন। কারণ তিনি দেখছিলেন তাদের পিছনে কোন লোক নেই।

যদি সালেন্ডার না করতো তাহলে আশংকা ছিল আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ লেগে যাওয়ার। আর যদি তা হতই তাহলে বাংলাদেশ হত ভিয়েতনাম বা তার চাইতেও দুরাবস্থার শিকার কিন্তু আল্লাহ আমাদের তা থেকে উদ্ধার করে নিয়েছেন এটাও একটা গায়েবী মদদ ছিল।

২. এরপর যখন ভারতে প্রায় ৯৩ হাজার পাক সেনা বন্দী, এদিকে বাংলাদেশে বিহারী নিধন যজ্ঞ হয়ে যায়। আর জয় বাংলা না বলার কারণে যখন বহু আলেম, মৌলভী, মাওলানা ও বিভিন্ন গ্রুপের ইসলামপন্থীদের মারা হচ্ছিল তখন আল্লাহর গায়েবী মদদে লন্ডন টাইমস এ মন্তব্য হলো-দেখ, বাংলাদেশী ও ভারতীয়রা। আমরা কিন্তু মজলুমদের পক্ষে। যখন পাক সেনারা বাঙ্গালীদের মারছিল তখন আমরা বাঙ্গালীদের পক্ষে ছিলাম কারণ তখন বাঙ্গালীরা ছিল মজলুম। আর এখন তোমরা পাইকারীভাবে মারছো পরাজিত প্রতিপক্ষকে কাজেই এখন আমরা কোন পক্ষে যাব তোমরাই ভেবে দেখ। আমরা তো মজলুমদের পক্ষে। তারা ইন্দিরা গান্ধীকে জানাল আপনি এখনও "এলডার সিস্টার"এর ভুমিকায় আছেন আপনি এখন সম্মানজনক পথে নিস্পত্তি করে ফেলুন। আপনারা পাঞ্জাবীদের না চিনলেও আমরা তাদের চিনি। তারা ১০০ বছরেরও বেশি দিন পূর্ব থেকে আমাদের পরিচিত। তারা কখনও এ্যরেষ্ট হয়না, হয় মারে না হয় মরে। এইটাই তাদের ধর্মীয় চেতনা এবং এইটাই তাদের রক্তগত স্বভাব। কাজেই তারা পরাজিত হয়েছে এ কথা মনে করলে ভুল হবে। আর এ ধরনের ভুল করলে ভারত উপমহাদেশে আগুন লেগে

islamirenesaandolon.blogspot.com

যেতে পারে যার পরিণাম ভারতকেই ভোগ করতে হবে। এখনও বলি, ''এলডার সিস্টার''-এর মর্যাদা রক্ষা করে চলার সময় আছে। লন্ডন টাইমস এর এ ধরনের বক্তব্যে ভারত ঘাবড়ে যায়। তাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। ফলে তাড়াহুড়া করে পাক সেনাদেরকে স্বদেশে পাঠানো হয়, বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা হয়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। আমি মনে করি আল্লাহর গায়েবী মদদ ছাড়া এ ধরনের পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারেনা।

আর ১৫ই আগষ্টের ঘটনাকেও এ দেশের বহু মানুষ আল্লাহর গায়েবী মদদ মনে করে। এরপর একটা মজার ব্যাপার ঘটে যা কিছুটা রসের সৃষ্টি করেছিল। অর্থাৎ মার্কিন সপ্তম নৌ- বহর যখন বঙ্গোপসাগরে থেকে হুমকি দিচ্ছিল তখন ভারত চুপচাপ ছিল । আর যখন তারা চলে যায় তখন ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জগজীবন রাম খুব দম্ভের সাথে বলে দেখলেন, আসলো তো মার্কিন নৌ-বহর কিছু একটা করার জন্যে। কৈ একটা কিছু করলে পারতো তারা? একটা গুলি ছুড়লে পারত? তা হলে আচ্ছামত মজা দেখিয়ে ছাড়তাম।.....

জগজীবন রামের এ বক্তব্যে প্যারিসের হেরাল্ড ট্রিবিউনে মন্তব্য করা হলোঃ আর কিছু না হোক ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর একটা সময় জ্ঞান অবশ্যই আছে। তিনি তার দম্ভটা একটা উপযুক্ত সময়ে ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ সপ্তম নৌ-বহর বঙ্গোপসাগরে থাকা অবস্থায় মন্ত্রীবাবু মোটেই রা করেননি। সময় বুঝেই তিনি উচ্চ বাচ্য করেছেন। অর্থাৎ সপ্তম নৌবহর ফিরে যাওয়ার পরই এ মন্তব্যটা করেছেন।

প্রশ্ন ঃ বলা হচ্ছে প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে গণকবর আছে। এটা কতটুকু সত্য?

উত্তর ঃ এটা সত্য কি মিথ্যা তার জওয়াব বাংলাদেশের মানুষের কাছে বলার প্রয়োজন হয়না। যেমন মামা বাড়ীতে একটা পুকুর আছে কিনা এবং সে পুকুরে মাছ আছে কি নেই তা মায়ের কাছে বলা লাগেনা। বড়জোর অন্যের কাছে বলা লাগে। ঠিক তেমনই বাংলাদেশের প্রত্যেকটি ইউনিয়নের অধিবাসী, তারা অবশ্যই জানেন যে তাদের ইউনিয়নে ক'টা গণকবর আছে। তবে মোটেই যে গণকবর নেই আমি তা বলছি না।

মিলিটারীরা যাদের ধরে নিয়ে গিয়েছে পরে আর ফিরে আসেনি তাদেরকে অবশ্যই গণকবরে কবরস্থ করেছে। যেমন আমাদের যশোরের মরহুম মসিহুর রহমান সাহেব (প্রাক্তন মন্ত্রী) কে যশোর ক্যান্টমেন্টে ধরে নিয়ে

islamirenesaandolon.blogspot.com

যাওয়ার পর তিনি আর ফিরে আসেননি। এভাবে অনেকে আর ফিরে আসেনি তাদেরকে গণকবরই দেয়ার কথা। যেমন মিরপুর ১২নং বাস স্ট্যান্ডের নিকট বিহারীদের ৩৫/৩৬টা মাথা পুতে রাখা হয়েছে বলে স্থানীয় লোকে বলে থাকেন।

এভাবে কোন কোন স্থানে ২/১টা গণকবর আছে যা শহর এলাকায় তাছাড়া গ্রাম এলাকার এরূপ গণকবরের কথা যারা বলেন তাদের কথায় দেশের একটি লোকও ধাঁধা গ্রস্ত হয়না। প্রত্যেকেই বোঝে যে এটা কতটুকু সত্য। তবে বিদেশীরা মনে করে যে, হলেও হতে পারে।

বিশেষ করে ঐ সময়টা ছিল শ্রাবণ-ভাদ্র, আশ্বিন-কার্তিক মাস। তখন যারাই মানুষ মেরেছে তারা মেরেছে কোন নদীর ধারে নিয়ে। মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে। পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিফৌজরা যাদের মেরেছে তাদের অধিকাংশই মেরে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে অথবা বড় বড় বিলের ভিতর নিয়ে মেরে বিলের মধ্যে ফেলে দিয়ে এসেছে। কেউই কাউকে মেরে গণকবরের নজির স্থাপন রাখতে চায়নি।

আর গণকবরের প্রয়োজন হয়, ঢালাও ভাবে কচুকাটা করলে। সেভাবে কচুকাটা কেউই করেনি। এরূপ নজীর খুব কমই আছে যেখানে ঢালাওভাবে লোক মারা হয়েছে। তবে দু'এক জায়গায় যে হয়নি তা নয়, সাধারণতঃ বিহারী বসতিগুলোর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটেছে জানা যায়। আর পরে জয় বাংলা না বলার কারণে যাদেরকে হত্যা করা হয়েছিল তাদের লাশ পাওয়া গেছে এবং তাদের দাফন করা হয়েছে। যারা বলেন প্রতি ইউনিয়নে একটা করে গণকবর আছে, তারা জানিনা বাংলাদেশের কোন ইউনিয়নে বাস করেন কিনা, কিংবা অন্য কোন দেশে।

আমি এখনও বিশ্বাস করি যে, ঐ সময় দেশের অভ্যন্তরে গ্রাম অঞ্চলে যা ঘটেছে তার খবর যারা শহরে বাস করেন তারা জানেন না এবং যারা ৯ মাস ভারতে থেকে এসেছেন তারাও তা জানে না বরং আমরা যারা দেশের অভ্যন্তরে বাস করতাম তারাই ভাল জানি যে ব্যাপারটা কি ঘটেছিল। তা ছাড়া একই স্থান থেকে যখন দুই বিপরীত মুখী খবর শোনা যায় তখন যাদের গলার জোর বেশি তাদের কথাই দূরের লোক শোনে আর যারা আস্তে কথা বলে, যাদের ধমক দিয়ে কথা বলতে দেয়া হয়না তাদের কথা লোকে শুনতে পায়না।

islamirenesaandolon.blogspot.com

এই ঘটনাই ঘটেছে তখন। যারা ছিলেন বিজয়ী দল তারা যা বলেছেন তা বলেছেন গলা ফাটিয়ে ,তাই দূর থেকে তাদের কথাই শোনা গেছে আর যারা ছিলেন পরাজিত দলের লোক তারা বলেছে ভয়ে ভয়ে। তাদেরকে একদিকে যেমন ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয়া হয়েছে তেমন দূর থেকে তাদের কথা শোনাও যায়নি। ফলে প্রকৃত অবস্থা এখনও অজানাই রয়ে গেছে।

প্রশ্ন ঃ একাত্তরের কোন ধরনের ঘটনাগুলো এখনও অজানা রয়েছে? তা প্রকাশ হয়নি কেন?

উত্তর ঃ তা হল আদর্শবাদীদের দেশপ্রেম ও আদর্শহীনদের উৎকট দেশ প্রেমের ব্যবধানের ঘটনা। এ বিষয়ে কিছু অজানা কথা আমার নিকট রয়েছে যা বললে অনেকের মাথা হেট হয়ে যায়। বিষয়টি খোলাসা করার জন্যে একটি উদাহরণ দিচ্ছি– যা দুই বার বলতে হচ্ছে।

মাগুরার আওয়ামী লীগ নেতা মরহুম সৈয়দ আতর আলী সাহেব যে গ্রামের লোক আমিও সেই একই গ্রামের লোক। বরিশাল ফরিদপুরের যারাই পায়ে হেঁটে ভারতে গিয়েছে তাদের যাওয়ার পথ ছিল আমার গ্রামের বাড়ীর পাশ ঘেঁসে। জনাব শেখ সাহেবের আপন ভাই শেখ নাসের সাহেবও আমার বাড়ীতে এক মাসের বেশী সময় লুকিয়ে ছিলেন। ভারতে যাওয়ার পথের খবর পাওয়ার প্রতিক্ষায় ছিলেন। পাক আমলে লোক জানত এটা একটা নিরাপদ বাড়ী। আমার বইতেও উল্লেখ করেছি শালিখা থানার এক ন্যাপ নেতা মাষ্টার আঃ মালেক ও আরও ৬জন আমার বাসায় ৩ মাস পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয় পেয়েছেন কিন্তু মরহুম সৈয়দ আতর আলী সাহেবের (যিনি আওয়ামীলীগের এম,পি,এ ছিলেন) বিয়াই অর্থাৎ তাঁর মেঝো ছেলের শ্বশুর এক বিহারী বেচারা জীবন বাঁচানোর আশায় তার নিজের মেয়ে জামাইয়ের বাড়ীতে এসে আশ্রয় নেন এই আশায় যে আমার বিয়াই যেহেতু আওয়ামী লীগ নেতা কাজেই আমার জীবন সেখানে অবশ্যই রক্ষা পাবে।

কিন্তু দেশপ্রেমে এমনভাবে তাদের পেয়ে বসেছিল যে বিয়াই বাড়ীতেও বিয়াই সাহেবের জীবনটা রক্ষা পেলনা। অথচ সম্পূর্ণ বিপরীত মতাদর্শের মাষ্টার আঃ মালেককে আমি পাক সেনাদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে আসলাম। তাকে মারতে দিলাম না। আমি যদি বলতাম মাষ্টার আঃ মালেককে পাক সেনারা আমার হাতে থেকে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে তাহলে কে আমার নিকট কৈফিয়ত চাইত?

islamirenesaandolon.blogspot.com

প্রশ্ন ঃ গ্রাম অঞ্চলে এমন কিছু ঘটেছে কি যার খবর কেউ জানে না?

উত্তর ঃ কেউ যে জানে না তা নয়। যেমন যেখানে যা ঘটেছে সেখানকারঃ লোক তো অবশ্যই জানে তবে তা যেহেতু প্রচার হয়নি তাই নেতাদের কান পর্যন্ত হয়তো পৌছেনি। উদাহরণ স্বরূপ একবার বলা কথা আবারও বলছি। মাগুরা থানার কুচিয়ামোড়া ইউনিয়নের বড়শলই ও কলাইডাঙ্গা পাশাপাশি দুটি গ্রামের প্রতিটি লোকই আওয়ামী লীগের ছিলেন। তারা মাগুরায় তৎকালীন মন্ত্রী জনাব সোহরাব হোসেনকে দাওয়াত করে এনে একটা সোনার নৌকা উপহার দিয়েছিলেন।

মাগুরায় পাক মিলিটারীরা এসে পড়লে এই গ্রামের লোকেরা ভীত হয়ে পড়লেন। তারা যখন খবর শুনতেন অমুক জায়গা থেকে অমুককে মেরে ফেলেছে। আর বিশেষ করে তাদের গ্রাম দুটি একটি নদীর পাড়ে। তারা যখন ঐ নদী দিয়ে ২/১জনের লাশ ভেসে যেতে দেখল আরও ভীত হয়ে পড়ল। তখন গ্রামের বিচলিত মানুষ আমাকে নিয়ে মাগুরায় পৌছে দিয়ে যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। আমি মাগুরায় পৌছেই শুনি যে রাজাকারের সংখ্যা ১১হাজার যার মাত্র ৩৫টি ছেলে জামায়াতে ইসলামী ও মুসলিম লীগের আর বাদ বাকি সবই এসে রাজাকারে চাকুরি নিয়েছে এবং অনুগতদের ন্যায়ই পাক সেনাদের আনুগত্য করে যাচ্ছে। মাওলানা শামসুল হক সাহেব বললেন রাজাকাররা আমাদের নিয়ন্ত্রনের বাইরে। মাওলানা সাহেবও আমার ন্যায় একজন জামায়াতের সদস্য ছিলেন। তবে তিনি নোয়াখালীর আর আমি ছিলাম স্থানীয়। আমার মধ্যে স্থানীয় হিসাবে কোন দুর্বলতা ছিল না। কাজেই শান্তি কমিটির ওপরও আমি প্রভাব খাটাতাম যদিও আমি শান্তি কমিটির কেউ ছিলাম না। (প্রসঙ্গক্রমে একথাটি দুইবার বলতে হল)

আমি মাগুরায় গিয়ে শুনলাম হিন্দুরা খুব আতংক গ্রস্ত। তাই আমি ঐ গ্রামের হিন্দুদের মধ্যেই রইলাম। যেন তারা সাহস পায় পরে অবশ্য যখন উপনির্বাচনে এম,পি, এ হলাম তখন আমাকে শহরেই থাকতে হলো। এম,পি, এ হয়ে প্রথমেই চিঠি দিলাম বেরইলের আওয়ামী লীগ নেতা জনাব খন্দকার ওমর আলী সাহেবের নিকট যে, আসুন আমরা সবাই মিলে আমাদের এলাকাটাকে বাঁচাই।

এভাবে কয়েকখানা পত্র লিখলাম কয়েকজনের নিকট। ডাঃ লাল মিয়া কেতার গ্রামের জামায়াতের লোক জামায়াত কর্মী ডাঃ আঃ জলিলকে দিনে

islamirenesaandolon.blogspot.com

দুপুরে কুপিয়ে হত্যার দায়ে দোষী ব্যক্তিদের একজন মনে করত। আমি ভাবলাম তাকে যদি নিহত ডাঃ জলিল সাহেবের আত্মীয় স্বজন হাতে পায় তাহলে হয়ত মেরে ফেলতে পারে। তাই তাকে আমার বাসাতে রেখেছিলাম।

প্রথম দিন যখন তাকে আমার বাসায় নিয়ে আসি তখন ডাক্তার লাল মিয়ার শ্বশুর ভেবেছিলেন যে, তার জামাইকে মেরে ফেলার জন্যে আমার বাসায় নিয়ে এসেছি। তাই তিনি অনেক টাকা নিয়ে আমার নিকট থেকে খালাস করে নেয়ার জন্যে আসেন। আসেন কুচিয়ামোড়া ইউনিয়ন এর চেয়ারম্যান সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে।

আমি তাকে বুঝালাম, আমি মারার জন্যে আনিনি। বরং মারা থেকে বাচাঁনোর জন্য এনেছি। আর জান বাচাঁনোর জন্য কোন টাকা পয়সা দেয়া লাগবেনা। বহু লোক বহু চেষ্টা করেছে টাকা পয়সা দিয়ে তাদের আপন জনদের নিরাপত্তা পাওয়ার জন্যে কিন্তু তারা অবাক হয়ে দেখেছে একটি পয়সাও কেউ দিতে পারেনি। অবশ্য দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঐ ডাক্তার লাল মিয়াই দেখি যে একদিন কিছু টাকা নিয়ে এসেছেন এসে অতি নম্রভাবে বলেছেন,"আমরা জানি যে আপনার কোন আয় নেই কাজেই আমি কিছু টাকা নিয়ে এসেছি। পূর্বে যদি টাকা নিতেন তাহলে তা আজ আদায় করে নিতাম। পূর্বে যেহেতু টাকা নেননি তাই আজ টাকা দিতে এসেছি। যা হোক শেষ পর্যন্ত মুক্তিফৌজদের জন্যে যে রিলিফের মাল আসত তা থেকে আগে আমার সংসার চালানোর মত কিছু মাল পত্র দিয়ে পরে অন্যেরা ভাগ করে নিতেন।

এরপর আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বারবার আমাকে ধরার জন্য পুলিশ পাঠিয়েছে কিন্তু বারবারই গ্রামের লোকেরা পুলিশদের ফেরৎ পাঠিয়েছে। একবার ৪ঠা জুন ৭২ ইং পুলিশ আমাকে হাজতে নেবেই, আমিও প্রস্তুত হয়ে গেলাম হাজতে যাওয়ার জন্যে শেষ পর্যন্ত কি ঘটনা ঘটল তাতো পূর্বেই শুনেছেন। আমি তারপর দিনই ঢাকায় চলে আসি এবং ৬ই জুন মানিক গঞ্জের চর জামালাপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা নিয়ে সেখানে চলে যাই অতঃপর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর বাড়ী গিয়ে ঝিকরগাছা মাদ্রাসায় চাকুরী নেই।

আমি মাগুরায় থাকা কালে যখনই শুনছি অমুক জায়গায় রাজাকাররা লোক ধরে এনেছে। এমন খবর কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে দৌড়ে গিয়েছি। যে সাইকেলে গিয়ে খবর দিয়েছে তার সাইকেলের রড়ের উপর বসেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছি। কখনও ভাত খেতে বসে খবর শুনে এটো হতেই দৌড়ে গিয়েছি।

islamirenesaandolon.blogspot.com

খবর শোনার পর এবং আমার উপস্থিতিতে একটি লোকের গায়ে হাত দিতে দেইনি। একবার কয়েকজন প্রাইমারী স্কুল শিক্ষক বেতন নিতে মাগুরায় আসলে রাজাকার তাদের ধরেছে এবং মেরে টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছে। আমি খবরদাতার সাইকেলের রড়ের উপর বসেই সেখানে গিয়ে হাজির হলে আমুড়িয়ার মাষ্টার আঃ বারী সাহেব বললেন, আর দু'এক মিনিট দেরী করে আসলে আমাদের আর জীবিত পেতেন না। সিরিসদিয়ার মাষ্টার গোলক বাব আমাকে দেখে যেন জীবন ফিরে পেলেন।

এদের যারা মেরেছিল ও টাকা পয়সা কেড়ে নিয়েছিল তাদের আমি নিজে পিটিয়ে রাইফেল কেড়ে নিয়ে তাড়িয়ে দেই। এভাবে কয়েকজন যাদেরকে আমার বাসায় রেখে পাহারা দিয়েছি তারা স্বচক্ষে এসব দেখেছেন। এরপর মাগুরায় এগার হাজার রাজাকার যারা নৌকা থেকে নেমে এসেছিল তাদের সব দোষ গিয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপল।

যে সব নেতাগণ ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাদের পরিবারবর্গ তারা কোথায় রেখে গিয়েছিলেন তাও তারা পরে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলে। (প্রথম বার কিছু কথা বাদ পড়েছিল বলে দুই বার বলতে হল।)

আমার প্রশ্ন, যারা পরকালে বিশ্বাসী তাদের কার্যকলাপ আর যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় তাদের কার্যকলাপ কি এক হতে পারে? না তা অবশ্যই পারেনা। এরপর আমি পুনঃ প্রশ্ন রাখব- আমরা মাগুরায় চারজন জামায়াতের সদস্য, তার মধ্যে একজন ছিলেন নোয়াখালীর আর তিনজন ছিলাম মাগুরার। এর একজনকেও তো হাজতে যাওয়া লাগলোনা তার কারণ কি? আমরা কি কোন তন্ত্রমন্ত্র জানতাম নাকি কোন যাদুকর ছিলাম যে যাদুমন্ত্রের বলে সবাইকে বশ করে ফেলেছিলাম?

আমরা জামায়াত থেকে যে ট্রেনিং পেয়েছিলাম এবং পরকাল সম্পর্কে যে বিশ্বাস রাখি সেই বিশ্বাস মুতাবিকই কাজ করে থাকি। তবে দু'একজন যে ব্যতিক্রম ছিল না তা আমি বলছি না। কিছু ব্যতিক্রমও ছিল তবে একথা জোর দিয়েই বলতে পারি যে যারা লোক হত্যা করেছিল তাদেরকে যদি গলায় ফাঁসি দেয়া হত তবে দুনিয়া দেখত কোন দলের কত জনের গলায় ফাঁস পড়েছে।

সাধারণ ক্ষমার পিছনে যতগুলো কারণ কাজ করেছে তার মধ্যে এটা ছিল এক প্রধান কারণ। এরপর জয় বাংলা না বলার কারণে যাদেরকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে তা দেশের লোক স্বচক্ষে দেখেছে। তবে

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে আমরা যে এলাকায় ছিলাম তারা কেউ এ ধরনের চাপ আমাদের উপর সৃষ্টি করেনি। করলে ঈমান বাঁচানোর জন্যে হয়তো শাহাদাত বরণ করতে হত।

এসব কথা ২১ বছর পর আজ এজন্যে বলছি যে, কিছু লোক '৭১-এর দালাল নামটাকে একটা মূলধন করে ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানোর তালেই আছে। যাহোক আশা করি, এখন এটা পরিস্কার হয়ে গেল যে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র কি করে পুনর্বাসিত হতে পারে।

প্রশ্ন ঃ আপনি কি মনে করেন যে, আপনাদের যে সব ছেলেরা ছিল তারা সবাই নির্দোষী ছিল?

উত্তর ঃ না, আমি তা মনে করিনা। তবে নৃশংসতায় তুলনামূলক ভাবে ইসলামী গ্রুপের ছেলেরা কিছুটা কম ছিল এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তবে আমি চোখে না দেখলেও যা শুনেছি তাতে মাগুরার ইসলামী গ্রুপের দু'টি ছেলে ছিল খুবই নির্দয় যারা তখন থেকেই মাগুরা থেকে নিখোঁজ রয়েছে। আর যাদের কথা শুনেছি নিজ হাতে লোক মেরেছে তাদের একটিও বেঁচে নেই আর আসল কথা হচ্ছে এই যে, রাজাকারও যে মায়ের সন্তান মুক্তিফৌজরাও সেই মায়ের সন্তান। কাজেই এদের সবার মধ্যে খুব বেশি তারতম্য হওয়ার কথা নয়। তবে পরকালে বিশ্বাসী এবং পরকালে অবিশ্বাসীদের মধ্যে যতটুকু তারতম্য সাধারণতঃ হয়ে থাকে তাই হয়েছে।

তাছাড়া একই আবহাওয়াতে সাধারণত ঃ কমবেশী একই স্বভাবের চরিত্র গড়ে উঠে। এরপর রয়েছে বয়সের একটা বৈশিষ্ট্য। যে বয়সে ঐ সব ছেলেরা হাতে রাইফেল পেয়েছিল এবং আইনের কোন শাসন ছিলনা সেখানে স্বাভাবিকভাবেই নৃশংসতা ঘটেছে। অর্থাৎ তারা লোক মেরেছে । তবে এ মারার সংখ্যা যেমন ভাবে দেখান হয় তা খুবই অতিরঞ্জিত। আমার জানা মতে মাগুরায় আমুড়িয়া গ্রামের ১৪জন লোককে একদিন রাজাকাররা শক্রজিৎপুর থেকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলে আর রাজাকারদের পতনের পরে বুনাগাতি রাজাকার ক্যাম্প থেকে ২৯জন রাজাকারকে ধরে গঙ্গারামপুর নদীরঘাটে নিয়ে মুক্তিফৌরা মেরে ফেলে। সম্ভবতঃ এই ২৯ জনের ১ জন পালিয়ে যায়।

এই ছিল বড় ধরনের লোক হত্যা আর যা মরেছে তা ছিল মাঝে মাঝে ২/১ গ্রাম থেকে ২/১জন তা ছাড়া আমাদের এলাকায় বিশেষ করে আমাদের পাশ্ববর্তী কয়েকগ্রাম থেকে একটি লোকও মারা যায়নি। এমন কি আমাদের

islamirenesaandolon.blogspot.com

পার্শবর্তী সিমুলিয়া গ্রামে শতকরা একশত জন লোকই হিন্দু সেখান থেকেও একটি লোক মারা যায়নি এই জন্যেই বলেছি যে গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে ১ জন করে লোক মরেছে বলে মনে হয়না।

প্রশ্ন ঃ রাজাকার এবং মুক্তি ফৌজদের মধ্যে আপনি কিরূপ পার্থক্য মনে করেন?

উত্তর ঃ ঐ সময় যারা মুক্তিযোদ্ধা হয়েছিল তাদের এবং যারা রাজাকার হয়েছিল তাদের কোন দলের মধ্যে খুব বড় ধরণের পার্থক্য ছিল বলে আমি মনে করতাম না। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা যতটুকু না কাজ করছে তার চাইতে বেশি কাজ করেছে দুটো জিনিস যথা-

১. বাঁচার তাগিদ।

২. লুটপাটের সুযোগ সুবিধা।

আর আমার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এইরূপ যে এই অবস্থা কোন স্থায়ী অবস্থা নয়, এর অবসান ঘটবেই এবং এ দুই দল একদিন না একদিন একত্রিত হবেই।

কাজেই আমি সেই হিসাবেই তাদের দেখেছি। উদাহরণস্বরূপ বলব , একদিন ইজাহার নামে একটা ছেলে এসে আমাকে গোপনে বলে, এই দেখুন আমি ইন্ডিয়ান সেনাবাহিনীর নিকট থেকে ১টা পিস্তল পেয়েছি। আমি মুক্তিফৌজে একটা ভাল পজিশনে আছি। আমি বললাম ওটা লুকিয়ে ফেল। আবার তারই আপন ভাই সাদেক আহমদ একজন রাজাকার। এই ছিল তখনকার বাস্তব অবস্থা, এখন যিনি মাগুরার উপজেলা চেয়ারম্যান তিনিও সেদিন ছিলেন এক রাজাকার প্রধান অথচ সে লোক এক দিনের জন্যে জামায়াত বা মুসলীম লীগের কেউ ছিলেন না, এখন ও নন।

এই হচ্ছে বাস্তব অবস্থা। আমার এলাকায় ঐ সময় যখন রিলিফ বিতরণ করেছি তখন পাটখালী হাইস্কুলের বর্তমান হেড মাষ্টার মোঃ আবু জাফর- যিনি মাগুরার আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সৈয়দ আতর আলী সাহেবের ভাইপো এর নিকট রিলিফের মাল দিয়েছি এবং বলে দিয়েছি স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের হেড মাস্টার জনাব আকবর সাহেবের মাধ্যমে রিলিফ বন্টন করবে এবং মাষ্টার রোলে তার নাম সহি থাকতে হবে।

ঐ একই গ্রামে আমার বাড়ী। আমার ভাই বন্ধু আত্মীয় স্বজনও ছিল সেখানে। তাদের মাধ্যমেও রিলিফ বন্টন করতে পারতাম, কিন্তু তা

islamirenesaandolon.blogspot.com

করিনি। এমনকি মাষ্টার আবু জাফরকে বলেছি, আমার কোন ভাই বন্ধু বা আত্মীয় স্বজন যেন আমার নামে একসের গম, আটা বা চাইল বেশি না নেয়। এটা শুধু আমার ব্যাপরই নয় বরং যারাই পরকালে বিশ্বাসী তাদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা ছিল এইরূপ। এইরূপ নজীর দেশ প্রেমিকরা কেউ দেখাতে পেরেছেন কি?

কিন্তু পরে অবস্থার চাপে কেউ হলো দেশের শত্রু আর কেউ হল দেশের বন্ধু। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে এই যে কাগজে কলমে এবং ইথারে যে সব কথা ভেসে বেড়ায় তা জনগণের অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না। পারেনা বলেই তো জামায়াতের লোক কোন ভন্ডামী এবং অর্থ ব্যয় ছাড়াই এই স্বাধীন বাংলাদেশের স্বাধীন নাগরিকদের ভোট পায়। এবার স্বাধীনভাবে ভোট হলে এবং বি, এন, পির লোকেরা মোনাফেকী না করলে ও গণনায় কারচুপি না হলে অনেকের ধারণা জামায়াত শতাধিক আসন পেত। আমার হিসাব মতে এবার জামায়াতের ১৩৮টি আসন পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল।

১৯৪৭ সালে আমাদের একটা পরাজিত প্রতিপক্ষ ছিল, তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করেছিলাম আজ তা মনে পড়ে, মনে পড়ে বলে মনের কষ্টে কিছু কথা বলব শেষের দিকে।

প্রশ্ন ঃ মুক্তিযুদ্ধ চেতনা থেকে একটা মহল কি বুঝাতে চান বলে আপনি মনে করেন ?

উত্তর ঃ আমার মনে হয় মুক্তিযুদ্ধ চেতনা শব্দ থেকে তারা বুঝাতে চাচ্ছেন যে এ দেশে যে ইসলাম চলতে পারবেনা তা ৭১ এর ১৬ই ডিসেম্বরই চূড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে। যে দিন জয় বাংলা চূড়ান্ত বিজয় লাভ করল সেই দিন থেকেই এটার ফয়সালা হয়ে গেছে যে, এটা জয় বাংলার দেশ এটা ইসলামের দেশ নয়। আর এ যদি তারা বলতে চায় তাহলে আমার একটু কথা আছে। আমাদের মধ্যে কিন্তু অনেক ছোট বড় চেতনা রয়েছে। যথা-

১. প্রথম ধরা যাক ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজির থেকে। তখনকার চেতনা হলো এই যে, এ বাংলা থেকে হিন্দু রাজত্ব শেষ হয়ে গেল এবং মুসলিম রাজত্ব শুরু হলো। এখন প্রশ্ন এ চেতনা কি শেষ হয়ে গেছে।

যদি যেয়ে থাকে তাহলে প্রশ্ন, এরপর কোন চেতনা তাকে অর্থাৎ পূর্বের চেতনাকে হটিয়ে দিল?

islamirenesaandolon.blogspot.com

২. এরপর পরবর্তী চেতনা লর্ড ক্লাইভের বিজয়ের চেতনা। তারপর সে চেতনার বিলুপ্তি ঘটল ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট। তাহলে আমি বলতে চাই ৭৫ এর ১৫ই আগষ্ট, ৭১ এর ১৬ ই ডিসেম্বর চেতনাকে বিলুপ্ত করতে পারে না। আর ৭১ এর চেতনাও ৪৭ এর চেতনাকে বিলুপ্ত করতে পারে না। কারণ ৪৭ এর চেতনার সূত্রপাত হয়েছিল একটা সীমানা দিয়ে দেশ বিভাগের মাধ্যমে সে সীমানা এখনও রয়েছে। যদি কোন দিন বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে ঐ সীমানা না থাকে তাহলে সেই দিনই বলা চলবে যে ৪৭ এর চেতনা এখন বিলুপ্ত হলো। আর দুই দেশের মধ্যে যে চেতনার বর্ডার সৃষ্টি হয়েছিল সে চেতনা বিলুপ্ত হয়নি। এটাই ধরতে হবে, এটাই একটা মহাসত্য, যে সত্য অস্বীকারের কোন পথ নেই।

প্রকৃত পক্ষে বাংলাদেশের জনগণের মগজ থেকে সে চেতনা মুছে যায়নি বলেই সীমানাটা এখনও রয়েছে এবং এখনও ইসলাম শব্দটিকে বাদ দিয়ে এদেশের কোন রাজনীতি চলছেনা। এ কারণেই আমি বলতে চাই যারা ৭১-এর চেতনাকে তুলে ধরতে চাচ্ছেন তারা মেহেরবানী করে ঐ চেতনার একট ব্যাখ্যা দিবেন যেন আমরা দেশবাসী সবাই তা বুঝতে পারি ৭১-এর চেতনার অর্থ কি?

এছাড়া আরও যে সব ছোট খাট চেতনা আমাদের মগজে রয়েছে তা আপাততঃ না হয় বাদই দিলাম। যেমন ৫২এর এক চেতনা, ৫৪এর এক চেতনা ৮২এর চেতনা, শেষ পর্যন্ত ৫৪ঘন্টা হরতাল থেকেও উদয় হলো আরেক ক্ষুদে চেতনার। এ ধরণের ছোট খাট চেতনার কথা বলতে গেলে তো বহু বড় বই হয়ে যাবে। কিন্তু তা কি বলতে পারি? তবে আমাদের মধ্যে একটা সর্ব প্রথম ও সর্বশেষ চেতনা আছে সেটা হচ্ছে লা ই লাহা ইল্লাল্লাহুর চেতনা। যে চেতনা থেকে এ দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ জনতাকে ফিরানো যাাবেনা। যাবে না বোমা মারলেও।

প্রশ্ন ঃ দালাল বলতে কি বুঝান হয় এবং দালাল কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর ঃ দালাল শব্দটা কিন্তু কোন গালমন্দ নয় এবং এমন কোন খারাপ শব্দও নয় যে কারও নামের সঙ্গে এ বিশেষণ জুড়ে দিলে তাকে সমাজে খুব হেয় প্রতিপন্ন করা যায়। যেমন চোর, ডাকাত, গুন্ডা-পান্ডা ইত্যাদি বিশেষণ গুলো যে অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে দালাল শব্দটা দিয়ে তা বুঝায় না। অর্থাৎ এ শব্দটা দিয়ে মানুষের কোন চারিত্রিক দোষ ত্রুটি বুঝায় না। এটা এমন

islamirenesaandolon.blogspot.com

একটা আধুনিক শব্দ যা পৃথিবীর প্রতিটি গণ্যমান্য লোকের নামের সঙ্গে রয়েছে, তা প্রত্যক্ষভাবেই থাকুক বা পরোক্ষভাবেই থাকুক। এমন কি আল্লাহর নবী রাসূলগণের নামের সঙ্গে ও এই দালাল বিশেষণটি জুড়ে দেয়া যায় সম্মান কমেনা, বরং বৃদ্ধি পায়। যেমন আল্লাহর প্রত্যেক নবী রাসূল (সঃ) ই ছিলেন একেবারে আল্লাহর খাস দালাল।

আমরাও তার দালালের দালাল। আবার দেখুন আমাদের দেশে কেউ ভারতের দালাল। যারা ভারতের দালাল তারা কিন্তু যত কথাই বলুক ভারতের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলবেনা। যদি বাংলাদেশ মরুভুমিও হয়ে যায় কিংবা যদি পানিতে ডুবে যায় তবুও তারা কিছু বলবেনা। তারা যদি আমাদের তালপট্টি, বেলপট্টি,নারিকেলপট্টি, সুপারিপট্টি, সব পট্টি হজম করে ফেলে তবু কিছু বলবে না। তারা যদি আমাদের বি,ডি আর সবগুলোও গুলি করে শেষ করে দেয় তবুও কিছু বলবেনা তারা যদি ভারতের মুসলমানদের রক্তে কারবালাও বইয়ে দেয় তবুও কিছু করবেনা। অবশ্য এটাকে আমি খারাপ কাজ বলছিনা, এটা হলো, এক একটা আদর্শগত ব্যাপার। কাজেই এটা করতেই হবে, নইলে দালাল হওয়া যাবেনা এবং না করলে বিশ্বাসঘাতক হতে হবে।

ঠিক তেমনই কেউ আছেন চীনের দালাল। যদি চীনা দালাল কেউ এ দেশে থাকেন তাহলে চীন ও চীনাপন্থীদের বিরুদ্ধে তারা কিছুই বলবেনা। চীনাপন্থী কেউ যদি ৭১ এর কোন বাস্তব অপকর্ম করেও থাকেন তবুও তারা কিছু বলবেন না। আর এটা না করাই হচ্ছে একনিষ্ঠ দালালীর লক্ষণ আর বলাটাই হচ্ছে বিশ্বাসঘাতকতা। কাজেই দালালীর ব্যাপারে কেউ বিশ্বাসঘাতকতা করেনা। আবার কেউ আছে রাশিয়ার দালাল, তাদের ও ঐ একই আচরণ হতে হবে। এটাই যুক্তি আর এটাই চলতি যামানার স্বীকৃত নিয়ম।

ঠিক তেমনই যদি এ দেশের কেউ আদর্শগত দিক থেকে সৌদি আদর্শ বা ইরাকী আদর্শ বা ইরানী আদর্শ বা পাকিস্তানী আদর্শ বা আফগানী আদর্শ কিংবা ধর্ম নিরপেক্ষ আর্দশ বা ধর্মহীন আদর্শ বা ধর্মীয় আদর্শ ইত্যাদি যে কোন আদর্শের ধারক বাহক বা দালাল হন তাহলে হতে পারেন, তাতে তো আইনগত কোন বাঁধা নেই। যদি কেউ বাংলার মাটিতে বসে চীনের দালালী করতে পারে তাহলে বাংলার মাটিতে বসে ভারতের দালালী কেন করা যাবেনা। ঠিক তদ্রুপ বাংলার মাটিতে বসে যদি ভারতের দালালী করা জায়েজ থাকে তবে এই মাটিতে বসে পাকিস্তানের দালালী করা কেন যাবে না।

islamirenesaandolon.blogspot.com

ঠিক তদ্রুপ পাকিস্তানের দালালী যদি করা যায় তবে রাশিয়ার দালালী কেন করা যাবেনা? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এই যে, কেউ কোন আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে সে সেই আদর্শের দালালী করতে পারে। কারণ এটা হলো মানুষের বিশ্বাসগত ও আদর্শগত ব্যাপার। কাজেই এতটুকুর জন্যে কাউকে দেশের শত্রু বলা যেতে পারেনা। তাছাড়া খাস করে বাংলাদেশ হলো ইসলামী চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত। অবশ্য এ চেতনাকে বিলুপ্ত করার সাধ্য কোন বড় জাদরেল শক্তিই নেই। এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এক শ্রেনীর দালাল চিরদিনই আছে এবং চির কালই থাকবে এটাই বাস্তব সত্য এবং এটা বাংলাদেশের সংবিধানও মেনে নিয়েছে।

প্রশ্ন ঃ আপনার কথায় মনে হচ্ছে বাংলাদেশের কিছু কিছু লোক আদর্শগত কারণে কোন কোন দেশের ভক্ত যেমন আদর্শগত কারণেই এ দেশের কিছু লোক চীনের ভক্ত, কিছু লোক রাশিয়ার ভক্ত, কিছু লোক পাকিস্তানের ভক্ত আবার কিছু দেখা যায় ইরানের ভক্ত কিছু দেখা যায় ইরাকের ভক্ত কিন্তু কোন দেশের ভক্ত কি পরিমাণ হবে, আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ দেখুন, আমি একজন সাধারণ মানুষ। আমার নিকট এর কোন পরিসংখ্যান রিপোর্ট নেই, তবে হাব ভাবে যা বুঝা যায় তাই বলতে পারি মাত্র। আপনারা লক্ষ্য করবেন যখন বিদেশী কোন রাষ্ট্র প্রধান আমাদের দেশে আসেন তখন কে কি পরিমাণ লোকের সম্বর্ধনা পেয়ে থাকে। যেমন ধরুন বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তানের নেতা, ভারতের নেতা ও আরও কত বিদেশী নেতা বাংলাদেশে এসেছেন এবং আপনারা লক্ষ্য করেছেন কোন দেশের নেতাকে এক নজর দেখার জন্য এবং তাকে প্রাণ ঢালা সম্ভর্ধনা জানানোর জন্যে লোকের ভীড় কত বেশী হয়। যাকে দেখার জন্যে যে পরিমাণ লোকের ভীড় হয় তার দেশের ভক্ত সেই পরিমান বেশী।

আর দেখবেন বিদেশী খেলোয়াড়রা যখন বাংলাদেশে খেলতে আসে তখন দর্শকগণ মনে মনে কোন না কোন দলকে সমর্থন করে থাকে। তাই দেখা যায় কোন দেশের জয় লাভে বিপুল সংখ্যক লোকের হর্ষধ্বনি আবার কোন দেশের জয় লাভে খুব কম সংখ্যক লোকের উৎফুল্য।

তা ছাড়াও ১৮ বছর আগে একটা ঘটনা আপনাদের মনে করিয়ে দিতে পারি। তা হচ্ছে ১৯৭৪ সালের কথা। সে দিন বাংলাদেশ সফরে এসেছিলেন এক শত্রু রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী। তাকে দেখার জন্যে ঢাকায় মানুষের এতবেশী

islamirenesaandolon.blogspot.com

ভীড় হয়েছিল যে সেদিন লোকে বলেছিল; ইতিপূর্বে ঢাকায় এত লোকের ভীড় আর কখনো দেখিনি। সেদিন জনতার ভীড়ের ভিতর থেকে শ্লোগানের আওয়াজ ভেসে আসছিল,"মুজিব ভুট্টো ভাই ভাই, ভুট্টো ভাই খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই" শেষ পর্যন্ত ভুট্টো খাদ্য দিল তো দিল একবারে ৪ জাহাজ ভর্তি খাদ্য ও বস্ত্র। এসব দেখেই বুঝতে হবে এ দেশের মানুষ কাদের ভক্ত কি পরিমাণ।

এসব কিসের টানে? তা কি একবারও আমরা খতিয়ে দেখেছি? এই ভাবে দেখা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এটাতেই বোঝা যায় যে কাদের কি পরিমাণ ভক্ত এদেশে আছ। তাছাড়া খোদ ভারত কি মনে করে তাও শুনুন।

ভারতের ফিল্ড মার্শাল মানেকশর (ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান) একটা বিবৃতি এসেছে ২৯ শে এপ্রিলের (৮৮) 'ষ্টেটসম্যানে'। তিনি বলেছেন– "যদি বাংলাদেশকে একটা ইসলামী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় তবে তাতে ভারতের আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই। যে দিন আমার সৈন্যরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেইদিনই আমি একথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশীদের কখনও ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিলনা। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য তারা ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা পাকিস্তান ও মক্কার দিকে তাকাবে। আমাদের সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্যে আমাদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য করা উচিৎ ছিল কিন্তু আমাদের রাজনীতিকরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মত আচরণ করেছেন"

এর থেকে ভরতীয়দের মনোভাবই তো স্পষ্ট হয়ে ভেসে ওঠে। কাজেই আমাকে আর নতুন করে কিছু বলা লাগবে কি?

প্রশ্নঃ প্রকৃত ব্যাপারে বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক কাদের বলা যেতে পারে? এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ এ ব্যাপারে আমার কিছু যুক্তিভিত্তিক মন্তব্য আছে। যা সর্ম্পূর্ণই আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য এবং যুক্তিনির্ভর বক্তব্য আর তা হচ্ছে এই যে—

আমি মনে করি বাংলাদেশের একটা বর্ডার আছে, এই বর্ডারটাকে বহাল রাখা এবং এর মধ্যে অন্য কোন দেশের কর্তৃক বহাল না হতে দেয়াটাই হল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে রক্ষা করা। এই কথাটাকে যদি মেনে নেয়া যায় তাহলে দেখা দরকার এই বর্ডার থাকাটার মধ্যে কাদের স্বার্থ কি পরিমাণ।

islamirenesaandolon.blogspot.com

যারা মনে করে বর্ডার থাকার কোন প্রয়োজন নেই তারাই হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু।

যারা মনে করে যত দিন বর্ডার আছে ততদিন আমরা আছি আর যখন এই বর্ডার মুছে যাবে তখন আমাদের অস্তিত্বও মুছেযাবে তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার রক্ষক। মনে করুন ১টা বাড়ীতে ১০ জন লোক বাস করে। এই বাড়ীটা অন্যের দ্বারা বেদখল হয়ে যাওয়ার ভয় আছে। কিন্তু ঐ বাড়ীর ১০ জনের ৩জন যদি মনে করে যে, একান্তই যদি বাড়িটা বেদখল হয়েই যায় তবে অন্য বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা আছে। আর ৭জন মনে করে এ বাড়ী দখল হয়ে গেলে আর কোথাও মাথা গোজার জায়গা নেই। এখন ভেবে বলুন ঐ বাড়িটাকে রক্ষা করার চেষ্টা তখন কারা বেশি করে করবে?

এই উদাহরণ থেকে বুঝুন এ দেশের স্বাধীনতার রক্ষক কারা। এটা এদেশের প্রত্যেকেই বোঝেন যে এ দেশের অল্প কিছু লোক আছে যারা মনে করে বর্ডার থাকে থাকুক, না থাকে না থাকুক। তাদের দ্বারা এ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা হওয়ার কথা নয়। বরং এ দেশের অধিকাংশ লোক যারা মনে করে যে, যতদিন এ দেশ স্বাধীন আছে ততদিন আমাদের অস্তিত্ব টিকে আছে। আর দেশ যদি অন্যের হাতে চলে যায় তাহলে আমাদের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে; তারা জান জীবন দিয়েও এ দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করবে।

প্রশ্ন ঃ বর্তমানে বিভিন্ন বামপন্থী মহল থেকে যেভাবে ইসলাম পন্থীদের ওপর হামলা হচ্ছে আর যেভাবে তাদের বিভিন্ন স্থানে মারতেছে তাতে তো মনে হচ্ছে যারা বর্ডার মুছে ফেলতে চায় তারা সংখ্যায় কম হলেও তারা শক্তিশালী আর যারা বর্ডার রক্ষার পক্ষে তারা সংখ্যায় বেশী হলেও বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ হয়ে রয়েছে ফলে তাদের শক্তি খুবই কম। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি?

উত্তর ঃ মনে হয় সে দিন আর বেশি দূরে নয়, যে দিন বামপন্থীরা সবাই মিলে হবে ১টা দল, আর যারা মসজিদে যায়, নামাজ পড়ে মুসলমান হিসাবে টিকে থাকতে চায়, তারা সময়ের দাবীতেই এক প্লাটফর্মে আসবে এবং এক সঙ্গে দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে। সে দিন দেখবেন ইসলাম পন্থীদের শক্তি মোটেই কম নয়। বরং বিগত ইতিহাস যা বলে তা আবার দেখবেন সারা দুনিয়ার মানুষ ঈমানদারদের ঈমানী শক্তির মোকাবেলায় সব শক্তিই নিঃসন্দেহে ফেল মারবে। তবে একটা কথা আছে 'ইসলাম জেন্দা হোতা হায় হার কারবালা কি বাদ।'

islamirenesaandolon.blogspot.com

তাই মনে হয় বাংলাদেশে ইসলাম কায়েম হওয়ার জন্যে সম্ভবতঃ আর একটা কারবালা অপেক্ষায় আছে। আজ দেখা যাচ্ছে একটা ইসলামী দল অর্থাৎ বড় দল জামায়াত শিবির যখন মার খাচ্ছে তখন অন্যেরা চুপ থেকে ভাবছে তাদেরকে ছেড়ে দেবে, তা ছাড়বেনা। দাড়ি-টুপি দেখেই তাকে ধরবে সে দিন বেশি দূরে নয়। কাজেই এখনও মাথায় সুবুদ্ধি আনা দরকার এবং এখন থেকেই সমস্ত ইসলামী দলগুলোর মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি হওয়া উচিৎ। নইলে পরিণাম খুবই ভয়াবহ হবে। এ বইয়ের ৩য় সংস্করণ প্রকাশকালেই প্রমাণ হলো যে, আমার দুই বছর পূর্বের মন্তব্য এবার সত্যে পরিণত হয়েছে। হযরত মাওলানা শায়খুল হাদিসের গায়ের রক্ত ঝরার পর। এভাবেই এ গরীবের কথা সত্যে পরিণত হতে থাকবে। তাই এখনই হুশিয়ার হওয়া উচিত।

প্রশ্ন ঃ আপনি এক জায়গায় বলেছেন যে, ৭১-এর যুদ্ধ যে স্বাধীনতা যুদ্ধ তা অনেকেই বুঝতে পারেনি। একথা কি ঠিক? ৭১-এর ৭ই মার্চ যখন শেখ মুজিব ঘোষণা দিলেন যে, "এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়, ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোল।" একথা বলার পর তো আর বুঝতে বাকি থাকার কথা নয় সেটা সত্যই ছিল স্বাধীনতার যুদ্ধ। এরপরও কি করে বলতে পারেন যে সেটা কিসের যুদ্ধ ছিল তা অনেকেই জানতে পারেনি?

উত্তর ঃ এ জবাব সত্যই কিছুটা জটিল বলে মনে হতে পারে কিন্তু আসলে তেমন জটিল কিছু নয়। কারণ শেখ সাহেব ৭ই মার্চ যে ঘোষণা দিয়েছিলেন ৮ই মার্চ সেই ঘোষণার উপর নিজেই টিকে ছিলেন না। এখানেই তো বিভ্রান্তি। ৭ই মার্চের ঘোষণার পর তিনি ২৫শে মার্চ পর্যন্ত কি করে ইয়াহিয়াখানের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতে পারেন?

তিনি একদিকে বলেছেন ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড় অন্য দিকে তার সাথে আলোচনার টেবিলে বসা, এর থেকে কি বুঝায়? এর থেকে তার নিজের দলের লোকই তো মনে করেননি যে এটা স্বাধীনতার যুদ্ধ। আওয়ামী লীগের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি মনে করেছিলেন এটা অধিকার আদায়ের বা ক্ষমতা লাভের যুদ্ধ। অনেকেরই ধারণা ছিল বড়জোড় মার্শাল জারী হতে পারে এর বেশি কিছু হবে না। এ ধারণা বহু আওয়ামীলীগ নেতাদেরই ছিল।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আসলে এর পিছনে ছিল ভিন্ন ষড়যন্ত্র। যা অনেকেই টের পায়নি। আওয়ামীলীগ নেতাদেরই যেখানে ব্যাপারট্া অনেকের অজানা ছিল সেখানে আমরা কি করে তা জানতে পারি বলুন। শেখ সাহেব নিজেই বলেছেন ৭ই মার্চের ঐ ঘোষণা না দিলে আমাকে ছাত্র নেতাদের হাতে গুলী খাওয়ার ভয় ছিল, বলেছেন খোদ ইয়াহিয়া খানের নিকট।

বৈঠকে প্রকাশ তাঁর ভাষাটা ছিল এইরূপ যে, তিনি ইয়াহিয়া খানকে বলেছিলেন ,আমি যদি আপনার কথা মত চলি তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলি করবে, আর যদি ছাত্র নেতাদের কথা মত চলি তাহলে আপনি গুলি করবেন, বলেন তো এখন আমি কি করি। এটাই ছিল শেখ সাহেবের অসহায়ত্ব ভাব। কাজেই বলা চলে, তিনি (শেখ সাহেব) নিজেই জানতেন না পাকিস্তানের হাজতে বসে। যে বাংলাদেশে কিসের যুদ্ধ হচ্ছে। অবশ্য তখন একটা বিদেশী মহল থেকে কলকাঠি ঘুরান হচ্ছিল তা বোধ হয় আজ আর কারও বুঝতে বাকি নেই।

প্রশ্ন ঃ একটা কথা দেশবাসীর নিকট অস্পষ্ট বলে মনে হয় তা হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের কৃতিত্ব কি মুক্তিফৌজের নাকি আওয়ামীলীগের? এবং সে সময় যেসব আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতে ছিলেন তাদের ভূমিকা কি ছিল?

উত্তর ঃ দেখুন এর জবাব তো আমাদের মুখে শোভা পায় না। তবে মুক্তিফৌজদের মুখে যা শুনেছি এবং সম্প্রতি প্রকাশিত অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা নামক বইয়ে যা লিখেছেন মুক্তিযুদ্ধের একজন অতি উচ্চস্তরের নেতা মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল সাহেব। (তার বইটা পড়ে দেখার জন্যে আমার অুনরোধ রইল) তার অল্প কিছুটার সারাংশ সংক্ষেপে আমার ভাষায় আর কিছুটা তার নিজের ভাষায়ই আপনাদের জানাতে চাই।

একবার মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল সাহেব নাকি বরিশাল থেকে নির্বাচিত এম. পি. এ জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জু সাহেবের কথা মত ভারতে লেঃ জেনারেল আরোরার কাছে যান অস্ত্র আনতে। জেনারেল আরোরা তার নিকট পরিচয় যানতে চাইলে তিনি সদ্য ঘোষিত প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন সাহেব ও মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীর নাম বললেন। অতঃপর জেনারেল আরোরা নাকি তাদের দুইজন সর্ম্পকে মন্তব্য করলেন। ঐ দুইটা ব্লাডি ইন্দুরের কথা আমি জানি না। ওদের কোন মূল্য নেই আমার কাছে। অন্য কোন সাক্ষী থাকলে তাই আমাকে বল।

islamirenesaandolon.blogspot.com

এরপর তিনি পড়লেন মুশকিলে পরে তাকে প্রায় বন্দীই করা হলো। ৪দিন পর্যন্ত অনেক প্রশ্ন করা হয় যার মাধ্যমে তারা জানতে চাইল পাক সেনাদের সম্পর্কে কিছু তথ্য। তিনি অন্যত্র লিখেছেন আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ "দেশের সাধারণ শান্তি প্রিয় জনগণকে হিংস্র দানবের মুখে ছেড়ে দিয়ে কোলকাতার বালিগঞ্জের আবাসিক এলাকায় একটি দ্বিতল বাড়ীতে বসে প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গী সহকারে (খন্দকার মোশতাক আহমদ বাদে) নিরাপদে তাস খেলছিলেন দেখে সেমুহূর্তে আমি বিস্মিত হইনি, মনে মনে বলছিলাম- ধরনী দিধা হও। তিনি লিখেছেন, সেই দিন থেকেই তিনি আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের উপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং তখন থেকেই তিনি প্রকারান্তরে আওয়ামীলীগ থেকে দূরে সরে পড়েন তার দাবী মুক্তিযুদ্ধের পুরা কৃতিত্ব মুক্তিযোদ্ধাদের-আওয়ামীলীগের নেতৃবৃন্দের নয়। বরং তিনি তার বইয়ে আর যেসব অভিযোগ করেছেন তা তার বইটা পড়েই জেনে নিন। আমার কলমে তা শোভা পায় না। কারণ আমি তো মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম না।

তার বইটা পড়ার আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে আমি কিছু বিষয় উল্লেখ করতে চাই যা হবে সে বইটার এক প্রকার সূচীপত্রের ন্যায় যেন মূল বইটা পড়তে আপনার ইচ্ছা বৃদ্ধি পায়।

তার বইয়ের মূল বক্তব্যের মাত্র কয়েকটি বিষয় এখানে উল্লেখ করছি।

১. মুক্তিযোদ্ধারা যখন দেশকে মুক্ত করার জন্যে হাজারও প্রকার কষ্টের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল তখন আওয়ামী নেতৃবৃন্দের কিছু সদস্য শরনার্থী শিবির থেকে অসহায় যুবতী হিন্দু মেয়েদের কোলকাতার শহরে চাকুরী দেয়ার নাম করে সেই অসহায় আশ্রয়হীনা যুবতীদের কোলকাতার বিভিন্ন হোটেলে এনে যৌন তৃষ্ণা মেটাতে বিবেকের দংশন বোধ করেননি। তারা বাঙ্গালী মুক্তিযুদ্ধের নেতা হবেন না তো হবে আর কে বা কারা ? [উক্ত বইয়ের ৩০ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য]

২. কাজী জহির রায়হান নাকি উক্ত নেতৃবৃন্দের অপকর্মের (আমি সংক্ষেপে অপকর্মই বলছি কারণ উক্ত বইয়ে যে ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে আমার মত একজন অমুক্তিযোদ্ধা দালালের কলমে শোভনীয় নয়, বলে আমি লিখলাম না। উক্ত বইয়ের ২৭পৃষ্টা) কিছু প্রমাণ স্বচিত্র দলিল সংগ্রহ করেছিলেন যে কারণে তাকে বেঁচে থেকে স্বাধীনতার পরবর্তী অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সুযোগ দেয়া হলো না। আর দেয়া হলনা ষ্টুয়ার্ড মুজিবকে, যিনি ছিলেন শেখ মুজিবের অত্যন্ত প্রিয় অন্ধভক্ত। তাকে গুলিস্তান চত্বর থেকে হাইজ্যাক করা হলো।

islamirenesaandolon.blogspot.com

৩. স্বাধীনতা বিরোধীদের বিষয় বলতে গিয়ে উক্ত বইয়ের ৮ম পৃষ্টায় লিখেছেন- "তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শংকা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শংকা এবং অনুমান যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে দেশপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না যারা রাজাকার আল-বদর হিসেবে পরিচিত তারা?

৪. তিনি দাবী করেছেন কয়েকজন কমিউনিষ্ট নেতাদেরই বক্তব্য ছিল মুক্তিযুদ্ধ চেতনার অর্থ হলো ইসলামকে এ দেশ থেকে উৎখাত করার চেতনা। এটা শেখ সাহেব সহ আওয়ামীলীগের মুক্তিফৌজদের কোন কথা নয়। বরং মুক্তিফৌজরা যথারীতি নামায আদায় করেছেন ও দোয়া দরূদ পড়েছেন।

৫. তিনি ৭২ এর সংবিধানের সমালচনা করে বলেছেন, এ সংবিধান আইন সিদ্ধ হয়নি কারণ ৭০এর নির্বাচন হয়েছিল পাকিস্তানের সংবিধানের অধীনে। সেখানে জনগণ নূতন সংবিধান তৈরি করার কোন ম্যান্ডেট দেয়নি। কাজেই জনগণের ম্যান্ডেট ছাড়া যে সংবিধান তা মেজর সাহেবের ভাষায় আইন সিদ্ধ নয় এবং সেই সংবিধানকে পবিত্র আমানত বলারও তিনি পক্ষপাতি নন। আর সে সংবিধানও নাকি ভারতে তৈরী বাংলাদেশে বসে নয়।

৬. সংবিধানের ৪ মূলনীতি সর্ম্পকে তার দাবী যে, তা ভারতের মাটিতে বসে তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে ভারতীয় রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অনুকূলে। তিনি দাবী করেছেন এরূপ সংবিধান তৈরী করা ও ৪টি মূলনীতি চাপিয়ে দেয়ার অর্থই ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যেন আদর্শগত কোন পার্থক্য না থাকে। অর্থাৎ বাংলার মুসলমান যেন ক্রমান্বয়ে ইসলাম থেকে দূরে সরে যায় তিনি এটাই বলতে চেয়েছেন।

৭. তিনি অভিযোগ করেছেন পাক বাহিনী জেনারেল ওসমানীর নিকট আত্মসমর্পন না করে ভারতের সেনাপতির কাছে কেন আত্মসমর্পণ করেছিল? সেদিন জেনারেল ওসমানী কেন অনুপস্থিত ছিলেন। তবে কি তিনি বন্দী ছিলেন?

৮. তার অভিযোগ যে মিত্র বাহিনী যশোর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস তন্ন তন্ন করে লুট করেছে এমন কি বহু নির্মানের জিনিসও লুট করেছে তার বইয়ের ৩৮ পৃষ্টা থেকেই দেখে নিন।

৯. সেই সঙ্গে এ অভিযোগ ও করেছেন যে আমি একজন দেশপ্রেমিক হিসাবে দেশের সম্পদ লটুপাট হয়ে অন্য দেশে চলে যাবে এটায় বাধা দেয়ায় আমাকেই এই স্বাধীন দেশে যে দেশ আমাদের ত্যাগ জুলুম কারাবাসের

islamirenesaandolon.blogspot.com

মাধ্যমে সৃষ্টি হলো সেই দেশেই আমাকে হতে হলো প্রথম রাজবন্দী। (তারপর হক কথা বলার কারণে কত যে কষ্ট পোহাতে হয়েছে তাকে, তার কিছু তিনি লিখেছেন বলেই জাতি আজ তা জানার সুযোগ পেল। এভাবে কত কথাই বের হবে পরে ইনশাআল্লাহ।)

১০. তিনি আর যে সব অভিযোগ করেছেন তার মধ্যে একটা অভিযোগ খুবই বেদনাদায়ক তাহল শরনার্থী শিবিরে যখন ভারতের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘোরাফেরা করেছেন। কে কোথায় কি অবস্থায় রয়েছে তা খোজ খবর নিয়েছেন– তারা অকাতরে অর্থদান করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে আওয়ামীলীগ নেতাগণ তাদের কোন খোঁজ খবর নেননি বরং তাদের নামে বিভিন্ন স্থান থেকে অর্থ সংগ্রহ করে তার একটা মোটা অংশ ভারতের বিভিন ব্যাংকে বেনামে জমা রেখেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করি এইটাই কি দেশপ্রেমের লক্ষণ। আর এটাই কি হওয়া উচিৎ নেতাদের কাজ?

১১. তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে যারা ইসলাম পন্থী ছিলেন তারা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার শত্রু ছিলেন না। তারা ছিলেন ভারত ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শের বিরোধী। আর বিরোধী হওয়ার মূল কারণ ছিল তৌহিদী মতবাদ আর ব্রাহ্মণ্যবাদী শেরেকী মতবাদ সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী মতবাদ। যার সংমিশ্রণ কোন দিন সম্ভব হবেনা বলেই ভারত বিভক্ত হয়েছিল। আর তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গর্ভেই জন্ম নেয় বাংলাদেশ। কিন্তু বাংলাদেশের তৌহিদী জনতা কোন দিনও ব্রাহ্মণ্যবাদী আদর্শ মেনে নিতে পারবে না। তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে কয়েকজন রুশ ভারতের দালাল ছাড়া একটা মুসলমানও ইসলাম বিরোধী নয়।

১২. তিনি আরও অভিযোগ করেছেন পাকিস্তানকে দ্বিখন্ডিত করে মুসলিম শক্তিকে দুর্বল করার স্বার্থই ছিল ভারতের বড় স্বার্থ। আর তাঁর অভিযোগ যে – বিনা স্বার্থে তারা আমাদের সাহায্য করেনি।

এভাবে আরও বহু কথা মুক্তিফৌজদের কাছ থেকেই জাতি জানতে পারবে এবং তখনই আরো পরিস্কার হয়ে ধরা পড়বে বাংলার মুসলমান প্রকৃত পক্ষে সেদিন কি চেয়েছিল এবং প্রকৃত দেশ প্রেমিক কারা? এবারের মত এ আলোচনা আর দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা নেই তবে ভবিষ্যতে আল্লাহর মঞ্জুর হলে আরও কিছু হয়ত আপনারা পেতে পারেন। সত্য কোনদিন লুকানো থাকে না। আগুনকে যেমন খড় কুঠো দিয়ে বেশীক্ষণ ঢেকে রাখ যায়না। তেমন সত্যকেও মিথ্যা দিয়ে বেশিক্ষণ ঢেকে রাখা যায় না। সত্য প্রকাশ হয়েই পড়ে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমি মনে করি আল্লাহই এমন পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি করবেন যে যারাই একদিন পাঞ্জাবীদের তাড়িয়ে ছিল ঠিক তাদেরকে দিয়েই আল্লাহ রুশ ভরতের মতাদর্শকে এই বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করাবেন। আমার বইয়ের অন্যত্র উল্লেখ করেছি যে, ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের না ছিল কোন চিন্তা ভাবনা এবং না ছিল কোন পূর্ব ধারণা না ছিল কোন আশা ভরসা। তবু হঠাৎ করে এক এক সময় এক এক ধরণের গায়েবী মদদ এসে গিয়েছে- এই ধারা অব্যাহতভাবে চালু থাকবেই। এটা আল্লাহর ওয়াদা। হ্যাঁ, তবে শর্ত হচ্ছে গায়েবী মদদ পেতে হলে ইসলামপন্থীদেরকে ময়দানে কর্মরত অবস্থায় থাকতে হবে।- তবেই আসবে গায়েবী মদদ।

প্রশ্ন ঃ লোক ৩০লাখ না মরে যদি ২লাখ ৭৪হাজার মরে অর্থাৎ শেখ সাহেব ১০ই জানুয়ারী প্রথম ভাষণে যে সংখ্যা বলেছিলেন যদি সে সংখ্যাই ঠিক হয় কিংবা যদি ১লাখ লোকও মরে তবে মরেছে এতে তো কোন ভুল নেই। কিন্তু আমাদের শেষ প্রশ্ন হলো এই যে, এর জন্যে পরকালে তো অবশ্যই বিচার হবে। এই বিচারের প্রধান আসামী কে বা কারা হবে বলে মনে করেন?

উত্তর ঃ এত বড় সাংঘাতিক প্রশ্ন। এ প্রশ্নের জবাব তো খুবই কঠিন ব্যাপার। তবে আল্লাহ যেহেতু আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি, বিবেক -বিবেচনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কাজেই আমরা যদি নিরপেক্ষ মনে চিন্তা ভাবনা করি তবে এ ব্যাপারে প্রকৃত সত্যের খুবই কাছাকাছি একটা ধারণা পেতে পারব ইনশাআল্লাহ। দেখুন মানুষের কোর্টে যখন কোন খুনের বিচার হয়, তখন অনেক কিছু দেখা হয়। দেখা হয় খুন করল কে? খুন করার কারণটা কি ছিল? খুনের জন্যে উস্কানি দিয়েছিল কে? এর হুকমদাতা কে ছিল? গন্ডগোলটার সুত্রপাত বা সৃষ্টি হলো কি নিয়ে- ইত্যাদি অনেক কিছু দেখে তার বিচার হয়।

যদি প্রমাণ হয় যে সম্পূর্ণ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা নিতে গিয়ে কাউকে হত্যা করা লেগেছে তাহলে হত্যাকারী দোষী হয়না বরং যে প্রথম আক্রমণকারী হিসাবে চিহ্নত হবে তাকেই দোষী করা হয়। ঠিক তদ্রপ যদি কোন খুনের ব্যাপারে কাউকে নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা হয়। যে সে হুকুমদাতা ছিল এবং সেইই খুনটা ঘটিয়েছে তাহলে তাকেই প্রথমে দোষী করা হয়। এই ধরনের অনেক কিছু দেখেই তার বিচার হয়।

আর মানুষের দরবারে যখন বিচার হয় তখন বিচার সঠিক হওয়ার পক্ষে সহায়তা করে সাক্ষীগণ এবং আইনের দিক থেকে বিচার কিরূভাবে

islamirenesaandolon.blogspot.com

ন্যায় সঙ্গত হবে তার জন্যে বিচারককে সাহায্য করেন উকিল বা আইনবিদগণ। কিন্তু আল্লাহর দরবারে বিচারের ক্ষেত্রে খোদ আল্লাহই সাক্ষী এবং সাক্ষী তার (যার বিচার হবে) নিজের অঙ্গ-প্রতঙ্গ। কাজেই সে বিচার হবে সর্ম্পূণ নিখুত।

আমার মনে হয় এসব খুনের বিচারের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখবেন এই উপমহাদেশে লোক খুনের মূল উৎস কোথায়। এমন একদিন আমরাই ছোটকালে দেখেছি যখন (অর্থাৎ আজ থেকে ৫০বছর পূর্বে) কোন খুনের খবর শোনা যেত না। কোন গ্রামে কোন মারামারির ফলে কেউ নিহত হলে সেখানে বিশ নং আইন জারী করা হত। (বর্তমান জামানায় যেমন ৪২০ নং আইনটা বেশ পরিচিত ঠিক তদ্রুপ কখন বিশ নং আইনটা এরূপ পরিচিত ছিল) অর্থাৎ যে গ্রামে লোক খুন হত সে গ্রামের লোকদের প্রায়ই পাইকারী হারে বন্ধী করা হত। আসামীদের বাড়ী ঘর দরজা পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে দিত। দেখেছি পুলিশে ধানের গোলা কেটে ধান পর্যন্ত রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলত। তাতে সাধারণ লোকের মন এমন আতংক সৃষ্টি হত যে কেউ লোক খুন করার চিন্তাও করত না। এরপর দেশ ভাগ হলো, খুন সস্তা হওয়া শুরু হলো। এরপর যতই দিন যায় খুন ততই সস্তা হয়। পরে এই ধারা চালু হয়ে যায়। এক সময় তো লোকে বলতে শুরু করল বাংলাদেশে শব চাইতে সস্তা নুন আর খুন।

এবার আসুন দেখি এই উপমহাদেশের আর কোথায় খুনের মাত্রা বেশী? (অবশ্য এখন যে বাংলাদেশ থেকে খুন একেবারে বিদায় নিয়েছে তা নয়) এ প্রশ্ন করলে মানুষ কোন চিন্তাভাবনা ছাড়াই বলবে বাংলাদেশে আর ভারতে, বিশেষ করে ভারতের পাঞ্জাব রাজ্যে ও অধিকৃত কাশ্মীরে। এছাড়া উপমহাদেশের আর কোথাও এতো বেধড়ক খুন হতে দেখা যায়না। এবার প্রশ্ন কেন এই সব অঞ্চলে এতো খুন? এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে একটু পিছনের ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে।

দেখুন বেশী দূরের কথা নয়, বৃটিশ আমলে এই বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষই দেখেছে, হিন্দুরা মুসলমানদের কি নজরে দেখত। মুসলমানরা হিন্দুদের মেটে পাত্র ছুয়ে দিলে তা মরে যেত, হিন্দুরা তা ভেঙ্গে ফেলে দিত, ব্যবহার করত না। আমরা স্বচক্ষে দেখেছি কোন টিউবওয়েল থেকে হিন্দু মুসলমান একত্রে পানি আনতে গেলে যতক্ষণ হিন্দু মেয়েরা পানি নিত ততক্ষণ পর্যন্ত মুসলমান ছেলে মেয়েরা টিউবওয়েলের পার্শ্বের শান বাধান পাকা জায়গাটুকু পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারত না, তাদের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হত।

islamirenesaandolon.blogspot.com

হিন্দুরা মুসলমানদের আর কি নজরে দেখতো তার কয়েকটি বাস্তব কথা এখানে তুলে ধরছি, যেন আমার পরবর্তী কথা বুঝতে সহজ হয়।

১. (সে বৃটিশ আমলের কথা) মাগুরায় শারশা থানার ঘোষগাতি গ্রামের কবি হাবিবুর রহমান সাহেবের ছোট ভাই- তিনি একমাত্র ব্যক্তি যিনি তার যামানার ঐ এলাকায় পন্ডিত সাহেব নামে পরিচিত ছিলেন এবং তার উন্নত চরিত্র এবং পরহেজগারীর কারণে এলাকায় জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। সেই পন্ডিত সাহেব একদিন এক ওয়াজ মাহফিলে ওয়াজ করতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে বললেন যেখানে আমি নিজে উপস্থিত ছিলাম- একদিন আমার ছাত্র জীবনে পুলুম বাজারের উপর দিয়ে যাওয়ার সময় কয়েকজন হিন্দু জেলেরা (যারা মাছ ধরে) তারা আমাকে দেখে বলছিল ছেলেটি মুসলমানের হলে কি হবে আসলে ছেলেটা ভদ্র।

অপর একদিনের একটা ঘটনা শুনুন, সে হচ্ছে ১৯৭০সালের কথা। তখন খুবই অসুস্থ ছিলাম। তখন আমাদের এলাকায় অর্থাৎ মাগুরার মোহাম্মদপুর থানায় নহাটা গ্রামের চন্দ্র কবিরাজের নিকট থেকে কবিরাজী মতে চিকিৎসা নিচ্ছিলাম। তিনি খুবই ভাল করিরাজ এবং উন্নত চরিত্রের লোক ছিলেন তার বয়স ছিল ৮০ বছর। তিনি এক সপ্তাহের ওষুধ দিতেন, আমার ছোট ভাই যে একজন বি,এ পাশ শিক্ষক (খন্দকার ফসিয়ার রহমান) সে সপ্তাহে একদিন সেখান থেকে আমার জন্যে ওষুধ এনে দিত। একদিন ওষুধ এনে আমার হাতে দিয়ে বলছে এই হলো আমার কবিরাজ বাড়ী থেকে ওষুধ আনার শেষ দিন। আমি মরে গেলেও আর সেখানে ওষুধ আনতে যাবনা।

দেখলাম তার মনটা খুব ভার। জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে? বলল হবে আর কি। কিছুই হয়নি।

তবুও জিজ্ঞেস করলাম বলতো ব্যাপারটা কি? কবিরাজ বাবুর এক বিধবা মেয়ে থাকে সেখানে। সেই কবিরাজ বাবুর সংসারের একমাত্র মহিলা এবং একটা নমশুদ্র বংশের কাজের মেয়ে আছে যে রান্নাবান্নার কাজ ছাড়া আর বাকি কাজগুলো করে। রাতে তাদের বাড়ীতে গিয়ে থাকে আর সকালে ৭/৮টার দিকে আসে। আজ আমি তার পৌছারও আগে গিয়ে পৌছলাম কবিরাজ বাবুর বাড়ী। সেদিন সে কাজের মেয়েটা আসল একটা অপরিস্কার কাপড় পরে। অতঃপর কবিরাজ বাবুর বিধবা মেয়ে তার অপরিস্কার কাপড় দেখে তাকে তিরস্কার করে বলল, দেখতো একটা মুসলমানের ছেলে কি রকম

islamirenesaandolon.blogspot.com

পরিস্কার কাপড় পরে আসছে আর তুই হিন্দুর মেয়ে হয়ে এরূপ অপরিস্কার কাপড় পরে আসলি তোর লজ্জা করলোনা।

এটা হলো ১৯৭০ সালে পাক আমলের কথা। মুসলমানদেরকে এদেশের হিন্দুরা কোন নজরে দেখতো তা বুঝার জন্যে এই তিনটি উদাহরণই যথেষ্ট।

এ কারণেই ১৮৯৩ সালে কম্যুনিষ্ট পাটির একজন প্রতিনিধি মোঃ হালিম সর্ব প্রথম ভারত বর্ষে মুসলমানদের জন্যে একটা পৃথক আবাস ভূমির প্রস্তাব করেন। এরপর ১৯১৭ সালে ষ্টকহোমের আন্তর্জাতিক কমুনিষ্ট মহা সম্মেলনে দুইজন শীর্ষস্থানীয় ভারতীয় প্রতিনিধি আঃ জাব্বার ও আঃ সাত্তার ভারতীয় মুসলমানদের জন্যে পৃথক আবাস ভূমির দাবী উথাপন করেন। এরপর ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ভারতীয় বর্ণ হিন্দু দের আচরণ দেখে ১৯২৪সালে আলিগড়ের এক বক্তৃতায় মাওলানা মোহাম্মদ আলী ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে হিন্দ মুসলিম সমস্যার সমাধান না হলে একদিন ভারতবর্ষে হিন্দু ভারত বর্ষ ও মুসলমান ভারতবর্ষে বিভক্ত হবে। এমন কি লাল রাজপাতরায় পর্যন্ত ১৯২৪সালে অনুরূপ প্রস্তাবে ভারতের মধ্যে ৪টি মুসলিম রাজ্যের প্রস্তাব দেন তার প্রস্তাবে ছিল ঃ

১. উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ,

২. পাঞ্জাব

৩. সিন্ধু এবং

৪. বাংলা প্রদেশ মিলে মোট ৪টি পৃথক রাজ্যের কথা।

হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে অসম আচরণ দেখে ভারত বিভক্তির বহু প্রস্তাব হয়ে যাওয়ার পর সর্বশেষ ১৯৪০ সালের ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবে এটা পরিস্কার হয়ে যায় যে, এ উপ-মহাদেশের সংখ্যালঘু মুসলমানরা আর হিন্দু আধ্যিপত্যকে চিরদিনের জন্যে বরদাস্ত করতে রাজী নয়। তারা ভারত বিভক্তির ভবিষ্যত রূপরেখ তৈরী করে ফেললেন এবং তা শেষ করলেন শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক।

এটাই যে প্রথম বা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহই যে প্রথম এ দেশ ভাগ করতে চেয়েছেন তা নয়। বরং এর প্রথম প্রস্তাব আসছে ১৮৯৩ সালে একজন কমুনিষ্ট নেতা জনাব আঃ হালিম সাহেবের নিকট থেকে যা পূর্বেই জেনেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কেউই বাংলা ও পাঞ্জাব বা কোন প্রদেশ বিভক্তির প্রস্তাব দেননি। এ প্রস্তাব আসে একজন কাশ্মীরী ব্রক্ষণ পন্ডিত জওহার লাল নেহেরুর উর্বর মস্তিস্ক থেকে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

এরপর জিন্নাহর সঙ্গে মাউন্টব্যাটেনের তর্ক বাহাস হয়। তখন জিন্নাহ সাহেব বলেছিলেন যদি এ দুটি প্রদেশ (বাংলা ও পাঞ্জাব) আমাদের না দেন তা হলে কোন মতেই তাদেরকে ভাগ করতে পারবেন না। কারণ তারা তাদের পরিচয় জানে যে তারা পাঞ্জাবী এবং বাংগালী।

এরপর এ দুটো প্রদেশ যখন ভাগ হলোই এবং কাশ্মীরের একটা অংশ ভারত দখল করে রাখল তখন তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন এদেরকে যদি ভাগ করা হয় তবে অন্তহীন রক্ত ঝরতে থাকবে এবং সমস্যার পর সমস্যার জট পাকাতে থাকবে। এ কথাগুলো আসছে গত ৮/১২/৮৮ তারিখের দৈনিক ইনকিলাবের উপ সম্পাদকীয়তে। তারা উদ্বৃতি দিয়েছেন মাউন্টব্যাটেন এ্যান্ড দা পার্টিশন অব বেঙ্গল সাক্ষাতকার পর্ব বিকাশ পাবলিশার্স, দিল্লী পৃষ্ঠা–৪৩ থেকে।

এখন দেখা যাচ্ছে উপরোক্ত ভবিষ্যদ্বানী বাস্তবে ফলে যাচ্ছে। এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, পাঞ্জাব ও বাংলাদেশ ও কাশ্মীরে যে রক্ত ঝরছে এর জন্যে প্রধান দায়ী হচ্ছে সেই ব্রাহ্মণ পন্ডিত জওহার লাল নেহেরু এবং পরবর্তী দায়ী হচ্ছে তার মানসপুত্র– কন্যাগণ। পরবর্তী দায়ী হচ্ছে কিছু অবোধ মানুষ। আর যারা আত্মরক্ষার জন্যে কাউকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছেন, আল্লাহ তাদের কে মাফ করবেন। যদি আত্মরক্ষা ছাড়া অন্য কোন কারণের কিছুই তার মধ্যে আল্লাহ না পান।

প্রশ্ন ঃ এ রক্ত ঝরা বন্ধ হতে পারে কি করে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর ঃ আমি মাওলানা মোহাম্মদ আলী বা মোহাম্মাদ আলী জিন্নাহর ন্যায় অত বিজ্ঞ ব্যক্তি নই, কাজেই এর উত্তর দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এর কিছু আংশিক উত্তর দেয়া যায়। এর আংশিক উত্তর হচ্ছেঃ– এর জন্যে প্রয়োজন এ দেশের যুবক ছেলেদের বিগত ২/১শত বছরের ইতিহাস পড়ান। আর মুসলমানদের সত্যিকার ইসলাম বুঝান এবং যে চেতনার ভিত্তিতে দেশ ভাগ হয়েছিল সেই চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা। যেন তারা যে ভুল পথে দৌড়াচ্ছে সেদিক থেকে ফিরে এসে খাটি মুসলমান হতে পারে। আর তাদের বুঝাতে হবে যে, তাদের পূর্ব পুরুষদের চেতনা কি ছিল এবং তারা কোন পথে চলেছেন। যারা অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন কিন্ত কোন ব্রাহ্মণ্যবাদী নীতির কাছে মাথা নত করেননি। আমরা যে তাদেরই বংশধর এ কথা স্মরণ করতে হবে।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলতে পারি যদি আমরা আমাদের জাতিকে বিশেষ করে জাতির যুব সমাজকে বুঝাতে পারি যে, আমরা কোন জাতি এবং আমাদের ধমনীতে কোন রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে দেখবেন যারাই এ দেশটাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল তারাই এ দেশটাকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করবে এবং তারাই এ দেশটাকে পাকিস্তানের পূর্বে ইসলামী আইনের দেশে পরিণত করবে।

এ প্রশ্নে বাকি গুরুত্বপূর্ণ দিকটার জবাব পাবেন কয়েক বছর পর। আজও এ জবাব গ্রহণ করার মত অবস্থা আসেনি। কেবলমাত্র ২১ বছর গেল আর ৪ বছর পর এ জবাব মিলবে ইনশাআল্লাহ কাজেই আরও কিছুদিন সবর করতে হবে। এটা বলছি এই জন্যে যে ১৭বছর পরে মেজর (অবঃ) এম, এ, জলিল যা বলেছেন ১০বছর পূর্বে তাকে দিয়ে তা বলানো যেতোনা। কারণ তা গ্রহণ করার মত মন তখন কারও ছিলনা। তাই এ প্রশ্নের জবাব নেয়ার মত মন তৈরী হতে যে সময়টা লাগবে সেই সময়টার কথাই বলছি।

প্রশ্ন ঃ আপনি যে প্রশ্নটার উত্তর ৪ বছর পরে দেওয়ার কথা বলছেন ঐটার উত্তর আজ দিলে ক্ষতিটা কি?

উত্তর ঃ প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করার জন্যে মানুষের মন উত্তর গ্রহণের অনুকূল হওয়া দরকার। নইলে উত্তর গ্রহণ করতে পারে না, অযথা একটা বিতর্কের সৃষ্টি হয়।

যেমন আমার মনে আছে একটা ঘটনা ৭১সালে সম্ভবতঃ মে বা জুনের দিকে হবে আমাদের গ্রামের শাফু নামের একটা ছেলে গাবতলা বাজারে বসে বলেছিল যে টিক্কাখানকে মেরে ফেলা হয়েছে। কথাটা আমার নিকট বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু দেখলাম সেখানে যারা আওয়ামী লীগার ছিলেন তারা সবাই খবরটা বিশ্বাস করলেন এবং বেশ আনন্দ করতে লাগলেন। আমি বললাম এটা কোন সংবাদ নয়, এটা গুজব। কিন্তু খবর দাতা শাফু (মাগুরার আওয়ামীলীগ নেতা সৈয়দ আতর আলী সাহেবের আপন ভাগ্নে) বলল আমি ঢাকা থেকে নিজে দেখে এসেছি টিক্কা খানকে কুর্মিটোলা গোরস্থানে দাফন করা হয়েছে। যেখানে গঙ্গারামপুর হাইস্কুলের হেড মাস্টার জনাব গোলাম আকবর সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি ও বললেন এ খবর মিথ্যা হতে পারেনা।

আমি একা তর্কে কতক্ষণ টিকতে পারি। আমি শেষ পর্যন্ত বললাম, ঠিক আছে, কয়েক দিন পরেই বুঝা যাবে খবর সত্য কি অসত্য। প্রকৃত ব্যাপার

islamirenesaandolon.blogspot.com

হচ্ছে এই যে, মানুষ কোন কোন খবর পছন্দ করে যা বলার সঙ্গে সঙ্গে মেনে নেয় তা মিথ্যা হলেও। আর কোন কোন খবরে মানুষ হয় বেজার। সে খবরগুলো সহজে মানতে চায় না তা সত্য হলেও তার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়।

যেমন রাসূলুল্লাহর নবুয়তী জীবনের প্রথম দিকেও যে কালেমার দাওয়াত দিয়েছে এবং পরকাল সম্পর্কে যা বলেছেন ২৩ বছর পরও ঠিক তাই বলেছেন কিন্তু যারাই প্রথম দিনের কথা বিশ্বাস বা গ্রহন করতে পারেনি তারাই পরে তা বিশ্বাস করে নিয়েছিল। তাদের যেমন সঠিক সংবাদ বিশ্বাস করতে সময় লেগেছিল ঠিক তেমনি আমাদেরও কিছু সময়ের দরকার আছে।

দেখুন, আজ যে কথাগুলো মেজর(অবঃ) এম,এ জলিল সাহেব বলেছেন এবং তা আমরা মেনে নিচ্ছি কিন্তু এটা আর ১০বছর পূর্বে তিনি আজকের মত করে বলতে পারতেন না। আর বললেও তার বিপদ ছিল। ঠিক তদ্রুপ আর কিছুদিন পর (২/১টা সরকার পরিবর্তনের পর) এমন একটা সময় আসবে যেদিন এ প্রশ্নের উত্তর গ্রহণ করার মত মন মগজ মানুষের তৈরী হয়ে যাবে। আরও দেখবেন আজ স্বাধীনতার যে ইতিহাস তৈরী হচ্ছে তা বাজারে অচল হয়ে যাবে এবং স্বাধীনতার নূতন ইতিহাস তৈরী হবে, আর তা তৈরী হবে তাদেরই হাতে যারা সত্যিকার অর্থে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

সেদিন অনেক অজানা কথাই ফাস হয়ে পড়বে। যেমন টিক্কাখান যে বেঁচে আছে তা আজ কাউকে বিশ্বাস করানোর জন্যে কারও সঙ্গে তর্কে লিপ্ত হতে হয়না। কিন্তু এই কথা বিশ্বাস করাতে গিয়ে ১৭ বছর পূর্বে সম্মানিত হেড মাস্টারের সঙ্গে তর্ক করে আমি হেরে গিয়েছিলাম। কিন্তু সময় প্রমাণ করে দিয়েছে যে, আসলে কে হারল। ঠিক তেমনই কিছু কিছু কথার জন্যে এখনো কিছু সময় দরকার।

যেমন ধরুন এখন যদি বলি ৭১এর যুদ্ধে আমরা স্বাধীন হইনি বরং বাংলাদেশ একটা তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে তা কি আজ কেউ মানতে পারবে? তা অবশ্যই কেউ মানতে পারবেনা। কিন্তু সময় যখন প্রমাণ করবে তখন আমাকে বলতে হবেনা, অন্যেরাই এমন অনেক কথা বলবে যা আজ কেউ না মানলেও পরে তা মানবে। দরকার শুধু সময়ের।

islamirenesaandolon.blogspot.com

ইতিহাস আবার নতুন করে লিখতে হবে ইনশাআল্লাহ

কিছু খবর আসে উপরের স্তর থেকে যেমন এসেছে মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল সাহেবের কাছ থেকে। আর কিছু খবর আসে নিচু স্তর থেকে। যেমন আমি কিছু গ্রাম্য কথা বললাম। এই সব কিছু মিলে হবে একটা সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। আমি নাম ঠিকানাসহ যেটুকু তথ্য এতে প্রকাশ করেছি এবং যেটুকুই মেজর (অবঃ) এম, এ জলিল সাহেব প্রকাশ করেছে তাতেই স্বাধীনতার ইতিহাস নতুন করে লেখার প্রয়োজন দেখা দেবে নিঃসন্দেহে।

এই দেখুন না গত ২৩শে ডিম্বেরের ৮৮ সাপ্তাহিক সোনার বাংলার প্রথম পাতায় মেজর (অঃ) এম,এ জলিল সাহেবের ফটোসহ একটা বিবৃতি এসেছে। তিনি বলেছেন-" জামায়াত মুক্তিযোদ্ধাদের উপর আঘাত হানিয়েছে ইহা মিথ্যা প্রচারণা।" এটা হচ্ছে বিবৃতির শিরোনাম, এর মধ্যে যা প্রধান তথ্য রয়েছে তা হচ্ছে,"স্বাধীনতার পর যারা এ দেশে প্রথম সরকার গঠন করিয়াছে প্রকৃত পক্ষে তাহারাই প্রথম মুজিব বাহিনী গঠন করিয়া মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করিয়াছে।"

তিনি আরও বলেন, "মুক্তিযোদ্ধাদের উপর নতুন করে কোন আঘাত আসেনি।" লোক হত্যার ব্যাপারে একজন মুক্তিযোদ্ধা আমার নিকট স্বীকার করেছেন, যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তিনি নিজ হাতে বহু লোক হত্যা করেছেন। যেহেতু তিনি এখন সৎ জীবন যাপন করছেন তাই তাঁর নাম ঠিকানা উল্লেখ করলাম না। তবে কেউ চ্যালেঞ্জ করলে অবশ্যই তার নাম বলব।

সম্প্রতি মেজর (অঃ) জয়নুল আবেদীন যিনি ৯ম সেক্টরের দ্বিতীয় সেক্টর কমান্ডার তিনি তার অতীতকে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আজ মরিয়া হয়ে পড়েছেন এ দেশে ইসলাম কায়েমের জন্যে। যেন আল্লাহর দরবারে কৈফিয়ত দিতে পারেন এবং ঐ একই সেক্টয়ের ১ম সেক্টর কমান্ডার লেখা ও কথার মাধ্যমে স্বীকার করেছেন, আওয়ামী লীগের কোন নেতা মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেননি এবং তারা মুক্তিযোদ্ধা নন।

কাজেই মুক্তিযোদ্ধা সম্পর্কে কোন কথা বলার কোন অধিকার তাদের নেই। বরং তারাই ভারতে বসে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যার নীল নকশা তৈরী করেছিল বলে মেজর (অঃ) এম, এ জলিল গত ১৫ই ডিসেম্বর ৮৮ জাতীয় প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে উদোর পিন্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর দিন এখন শেষ হয়ে

islamirenesaandolon.blogspot.com

এসেছে। এই ধরণের বহু কথাই ক্রমান্বয়ে বেরুতে থাকবে। তারপর দেখবেন ইতিহাসের চাকা কি করে উলট পালট হয়ে যায়। স্টালিনের আমলের কাহিনী থেকে এর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

আজকের মত এই পর্যন্ত। আল্লাহর ইচ্ছা হলে পরে আরও অনেক কিছু পাবেন। যদি আল্লাহ আমাকে সুযোগ দেন।

প্রশ্ন ঃ আমরা ৭১-এ ঘটনার যা কিছু শুনলাম তা শুধুমাত্র একটা এলাকার খবর। কিন্তু সারা দেশের অবস্থা কি অনুররূই ছিল?

উত্তর ঃ দেখুন লোকে বলে যখন দুপুর হয় তখন সব জায়গায়ই দুপুর হয়' এ কথাটা সারা পৃথিবীর জন্যে খাটেনা। তবে আমাদের এই ছোট্ট দেশটার জন্যে খাটে। অবশ্য টেকনাফ থেকে যখন সূর্যটা ওঠতে দেখা যায় তখন তেতুলিয়া থেকে দেখা যায় না। কিন্তু ১০/১৫ মিনিট পরেই তেতুলিয়া থেকে সূর্য দেখা যায়। এই যে মাত্র সামান্য ব্যবধান সময়ের মধ্যে, ঠিক তদ্রুপই খুব সামান্য ব্যবধান হতে পারে দেশের অন্যত্র। তাই বলে আকাশ পাতাল পার্থক্য যে নয় তা স্পষ্ট করেই বলা চলে।

বিষয়টি আরও পরিস্কার করে বলা যায় যে, ৭১-এ জান বাঁচানোর জন্যে মাগুরার একটা এলাকার দল মত নির্বিশেষে সর্ব সাধারণের মাঝে যেমন স্থানীয় জামায়াত নেতার প্রয়োজন পড়েছিল তেমন এদেশের সর্বত্রই একইভাবে প্রয়োজন পড়েছিল জামায়াতীদের যা একে একে প্রকাশ পাবে। তাঁরা দেশের লোককে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন।

আমাকে যখন ৪ঠা জনু, ৭২ পুলিশ গ্রেফতার করে, সেই দিন কলাই ডাঙ্গার কেরামত মুন্সির মা এসে পুলিশদের বলা শুরু করলেন আমার ৭ ছেলের ৬ জনই মুক্তিযোদ্ধা। তারা জানেনা যে কে দালাল আর কে দালাল নয়?

তিনি পুলিশদের লক্ষ্য করে বললেন, "তোমাদের নেতারা যখন আমাদেরকে পাঞ্জাবীদের গুলির মুখে ফেলে ভারতে গিয়ে মাসীমার বাড়ী উঠেছিল সেদিন আমাদের বাঁচালো কে? তোমরা তার খোঁজ রাখ?

তখন যাদের আশ্রয়ে আমাদের জান- মাল উদ্ধার পেল তারাই হলো দালাল। তাঁরা যদি দালাল হয় তবে আমরাও দালাল।

আমি যখন পুলিশের সঙ্গে থানায় যেতে প্রস্তুত হলাম তখন দেখলাম বহু মেয়ে লোকের চোখে পানি। বিশেষ করে আমার গ্রেফতারীর খবর পেয়ে

islamirenesaandolon.blogspot.com

গ্রাম-গ্রামান্তর হতে আগত শত শত মা-বোনদের চোখের পানি দেখে আমিও আমার চোখকে সামলিয়ে রাখতে পারলাম না। ভাবলাম যাদের সাথে আমার পরিচয় নেই তারা কিভাবে একজন দালালের জন্যে কাঁদছে। অথচ তাদের অধিকাংশই আওয়ামীলীগদের স্ত্রী, মা, বোন বা মেয়ে।

সেদিন আমি বুঝেছিলাম, পাড়াগাঁয়ের মানুষ দল দেখে না, দেখে মানুষ। এভাবে কত যে নেতাদের ঘরের মা, বোনেরা কত জামায়াত নেতার জন্যে লুকিয়ে কাঁদে কজন স্বামী তার খোঁজ রাখেন? কথাগুলো যদিও দিবালোকের ন্যায় সত্য তবুও অনেকের নিকটই এটা হবে অবিশ্বাস্য।

কিন্তু এই মহাসত্য বাংলার মানুষ আজ হোক আর কাল হোক তা বুঝবেই। ২ দিনের চাঁদ যেমন চোখ ওয়ালাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে হয় না, নিজেরাই দেখে নেয়। (অবশ্য যারা জন্মান্ধ তাদের কথা স্বতন্ত্র) পরিস্থিতির চাপে এসব কথাগুলো প্রকাশ পেতে কিছু বিলম্ব হচ্ছে মাত্র। হ্যাঁ, তবে যারা জন্মান্ধদের ন্যায় একেবারে অন্ধ হয়ে পড়েছেন তাদের কেউই এসব দেখতে পারবেনা। আর যাদের ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর দৃষ্টিশক্তিও আছে তারা অবশ্যই একদিন দেখবেন যে, ৭১এ দেশের অভ্যন্তরে প্রকৃত পক্ষে কি ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল এবং কারা ঘটিয়েছিল। আর তখন জামায়াতে ইসলামীর প্রকৃত ভূমিকা কি ছিল এবং কেন ছিল তা অবশ্যই ইতিহাসে স্থান পাবে।

আমি শেষ বারের মত আবারও বলছি যারা পরকালে বিশ্বাসী এবং যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় এদের চরিত্র কখনই এক প্রকার হতে পারে না। আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তারা ভিন্ন দলের হলেও তাদের নিকট নিরাপত্তা পাওয়া যায়। আর যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় তারা স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটলে নিজের দলীয় লোককেও হত্যা করতে দ্বিধা বোধ করে না, শুধু তাই নয়, প্রতিপক্ষের ঘাড়ে দোষ চাপানোর উদ্দেশ্যে নিজেদের দলীয় লোকদেরও হত্যা করে। এটাই তাদের স্বভাব; এরূপ নজির শত সহস্র রয়েছে।

প্রশ্ন ঃ জামায়াতের সব লোক কি এক প্রকার ছিল?

উত্তর ঃ মানুষ রাজনৈতিক দলে প্রবেশ করে দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য দেখে। এটাকে আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলে থাকি। বলি মাছ ধরা জালের সঙ্গে তুলনা দিয়ে। যেমন ইলিশ মাছ ধরা জালে ইলিশ মাছই ধরা পড়ে- আর কৈ মাছ ধরা জালে কৈ মাছই ধরা পড়ে। তবে কদাচিত ২/১টা অন্য মাছও ধরা পড়ে যায়। ঠিক তদ্রুপ আওয়ামী লীগের জালে আওয়ামীলীগ চরিত্রের লোক, ন্যাপের জালে ন্যাপ চরিত্রের এবং জামায়াতের জালে

islamirenesaandolon.blogspot.com

জামায়াত চরিত্রের লোকই ধরা পড়ে। তবে ২/১ টা ব্যতিক্রমের কথা আমি অস্বীকার করিনা।

প্রতিপক্ষের সাথে আচরণ

এককালে আমাদের প্রতিপক্ষ পরাজিত ছোট একটা দল ছিল তারাও ছিল শতকর ২%। তারা ছিল পূর্ব পাকিস্তান ভাগের কংগ্রেস কর্মী। তাদের সঙ্গে আমরা কিরূপ আচরণ করেছিলাম তা দেখা লোক এখনও বেঁচে আছে যেমন আল্লাহ আমাকে এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন। একবার মোহাম্মাদ পুর থানায় নহাটায় কংগ্রেস নেতা মরহুম নওশের আলী সাহেব মিটিং করতে এসেছিলেন-তার কর্মীরা আমার মাথার টুপি কেড়ে নেয়, এতে মুসলিম লীগ কর্মীরা এমনভাবে ক্ষেপে যায় যে, তাদের মিটিং হতেই দিল না। তাদের একটা মটরগাড়ী নহাটার নদীতে ফেলে দেয়। কংগ্রেসের ভাড়াটে গুন্ডাদের সাথে মুসলিম লীগ কর্মীদের মারামারি শুরু হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদপুর থানার বড় দারোগা (O/C) আমাকে বললেন, গোলমালটা থামিয়ে দিতে আমি ছিলাম মাগুরা মহকুমার মুসলিম লীগের ওয়ার্কার ইনচার্জ। আমি জনাব নওশের আলীকে রক্ষা করলাম। পরে প্রতিপক্ষের ওয়ার্কার ইনচার্জ জোকা গ্রামের জনাব মতিয়ুর রহমানকে আমার নিকটে নিয়ে এসে আমার গায়ের চাদর মুড়ি দিয়ে এক দোকানের ভিতর বসিয়ে রাখি তার গায়ে হাত দিতে দেইনি।

তাদের প্রথম উস্কানি ছিল আমার মাথার টুপি কেড়ে নেয়া। শেষ ফল দাড়াঁল তাদের নেতা আমার স্মরণাপন্ন হলে আমার গায়ের চাদর দিয়ে ঢেকে রেখে তাকে উদ্ধার করি। সেই দিনের আমার ভূমিকা দেখে ঐ লোক (জোকা গ্রামের প্রতিপক্ষ নেতা জনাব মতিয়ুর রহমান সাহেব) আমার উপাধি দিলেন- 'হাক্কানী সাহেব'। এখন তিনি জামায়াত সমর্থক।

'৪৭ এর ১৪ই আগষ্টের পর তাদের সাথে যে হৃদ্যতা স্থাপন করেছিলাম তাতে লোক মনে করত এরা বোধ হয় আপন ভাই। এটাই ছিল আমাদের যৌবন কালে প্রতিপক্ষের সঙ্গে আচরণ। আমরা মার ঠেকায়েছি, মারিনি কাউকে। আজও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলছি যারা বেচেঁ আছে তারা বিলক্ষণ তাদের কারো দিকে বাকা চোখেও চেয়ে দেখিনি। পূবের কথা সব ভুলে গেছি।

প্রতিপক্ষের এখনও যারা বেঁচে আছেন- তাদের সাথে আমার আচরণ দেখলে কেউ ঘূর্ণাক্ষরেও ধারণা করতে পারবে না যে, এরা এক সময় একে

islamirenesaandolon.blogspot.com

অপরের প্রতিপক্ষ ছিল। এর জলন্ত সাক্ষী নহাটার মুন্সি মুজিবুর রহমান। তিনি এখনও বেঁচে আছেন এবং এখন তিনি কড়া জামায়াত পন্থী। প্রতিপক্ষের সঙ্গে এইরূপ আচরণ করাটাই আমরা উচিৎ মনে করতাম।

কিন্তু আজ কি দেখছি। এরা কি পারবে আর কোন দিনও জনগণের নেতা হতে? পারবেন তাঁদের কিছু লোকদের নেতা হতে। যারা বর্তমানে তাদের মূল স্বভাবের নজীর স্থাপন করছেন। ২১ বছর পরও তারা সেই পুরাতন পায়তারা থামাতে পারেননি। আর আমরা ১৩ই আগষ্টের কথা ১৪ই আগষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম।

এটা ঠেকে পড়ে বলছি না, বলছি এমন সব আচরণ দেখে যা আমরা যৌবন কালে স্বপ্নেও কোন দিন চিন্তা করতে পারিনি। এই চরিত্র নিয়েই কিছু লোক চায় দেশ শাসন করতে। দেখে অবাক হই, তাই বললাম এমন সময় যখন ময়দানে কাজ করার মত বয়সও নেই, স্বাস্থ্যও নেই, সময়ও নেই। বলছি তখন এর পূর্বে কখনও বলিনি। সম বয়সের অনেকে চলে গেছেন। শাহ আজিজুর রহমানের সঙ্গে এক সময় কাজ করেছি। তাঁরা এবং অনেক সহকর্মীই এখন চলে গেছেন। এখন মনে পড়ে হজরত আলীর (রাঃ) শেষ জীবনের আক্ষেপের কথা। তিনি বলেছিলেন– যা এখনো কিতাবে সংরক্ষিত আছে। বলেছিলেনঃ–

"জাহাবার রিজালূল মুকতাদা বি ফিয়ালিহিম ওয়াল মুনকিরূনা লিকুলি আমরিন্ মুন্কারিন্, বাকিতু ফী খাল্ফিন ইয়ু যাইয়েনু বাদু হুম্ লি বাদীন্ লি ইয়্যুদ্ ফায়া মুবারুন্ আনমুবারিন্।"

নেতারা বা ইমামের যোগ্য লোকগুলো সব চলে গেছেন। চলে গেছেন তাদের কাজকামসহ (অর্থাৎ সে লোকও নেই, তাদের কাজও নেই) আর যারা মন্দ কাজকে ঘৃণা করতেন তাঁরাও চলে গেছেন, আমি এমন এক যামানায় বেঁচে রয়েছি যখন একজন তার দোষ ঢাকার জন্য প্রথম ব্যক্তিকে মর্যাদা দেয় আর অপর জনও তার দোষ ঢাকার জন্য প্রথম ব্যক্তিকে মর্যাদা দেয় (অথাৎ দোষীরা পরস্পর পরস্পরকে মর্যদা দেয় আপন দোষ ঢাকার জন্যে)।

আমি হিসাব করে দেখি এমন একটা যামানা এখন শুরু হয়েছে। এখন সৎ লোকগুলো সব দারুণভাবে অসহায়। আর বদ লোকগুলোরই পৌষ মাস।

প্রতিপক্ষের সঙ্গে কেমন আচরণ হওয়া উচিত তা আমি একজন বয়োবৃদ্ধ হিসাবে বলছি। আমাদের ৪৭ এর আচরণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ।

islamirenesaandolon.blogspot.com

কিন্তু আমি জানি যে, আমাদেরই কিছু নিরীহ যুবক ছেলেদের এমনভাবে অন্ধ করে ফেলা হয়েছে যে, তাদের এর থেকে উপদেশ গ্রহণ করার মত মন মগজ আর অনেকেরই নেই। এটা এ জাতির চরম দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। তাছাড়া আর কি বলতে পারি?

বাংলাদেশের মানুষ তাদের নিজ অবস্থা বোঝে

দেশের লোকদেরকে একেবারে অজ্ঞ মনে করা ঠিক না। তারা অনেক কিছুই বোঝে। এমন কি রিকশা চালকরাও রাজনৈতিক সচেতনতার দিক থেকে বেশ সজাগ। উহাহরণ স্বরূপ বলা চলে, এবারকার বন্যার সময় যখন প্রেসিডেন্ট সাহেব বার বার বলেছেন "এ পানি আমাদের পানি নয়" কিন্তু কাদের পানি তা একবারও মুখ দিয়ে উচ্চারণ করতে পারেন নাই। এ নিয়ে রিকশা ওয়ালারা পর্যন্ত মন্তব্য করেছে, এটা যদি কমপক্ষে ৬৯ সাল হত তা হলেও প্রেসিডেন্ট সাহেব বলতে পারতেন এ পানি কাদের পানি। শুধুমাত্র বলে ছিলেন "এ পানি আমাদের পানি নয়" তাতেই হেলিকপ্টার গুলি চলে গেল। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হলো " আমাদের প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্র আমাদের এ বন্যায় সর্ব প্রথম হেলিকপ্টার দিয়ে সাহায্য করেছেন; তাদের সাহায্যের কথা আমরা কখনই ভুলতে পারব না" ইত্যাদি অনেক কথাই আমাদের বলতে হলো।

মানুষ অনেক কিছু বোঝে কিন্তু বলতে পারেনা। কারণ "বলতে মানা" ভাসুরের নাম জানে সবাই তবে যেহেতু শাস্ত্রের বিধান তাই বলে না কেউ। তাই বলে এ কথা মনে করা উচিত না যে, ভাসুরের নাম আসলেই কেউ জানে না।

আমাদের ফারাক্কা নিয়ে যখন দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় তখন বলতে হয় আলোচনা খুব হৃদ্যতার ভিতর দিয়েই সমাপ্ত হয়েছে। আলোচনার ফলাফল সন্তোষজনক। কিন্তু এই ২১ বছরে তার বাস্তব ফল কি পেয়েছি? তবুও বলতে হবে আলোচনার ফলাফল সন্তোষজনক। না বলে তো উপায় নেই। কারণ আমরা বন্ধু রাষ্ট্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বন্ধুদের সঙ্গে কোন প্রকারেই বন্ধুতে ফাটল ধরান যাবেনা। কারণ আমাদের টিকে থাকতে হবে। এ সবই দেশের লোক বোঝে। অথচ ৭১ এর পূর্বে ফারাক্কা চালু করতেই বন্ধুরা সাহস পান নাই। এ কথা লোকে বলে তাই আমিও বল্লাম।

islamirenesaandolon.blogspot.com

ঈমানী সুতার টানে

৬ই ডিসেম্বর মাগুরা মুক্তিফৌজ ও মিত্রবাহিনীর দখলে চলে যায়। তখন দেখতাম যারাই মুরব্বি শ্রেণীর লোক- তাঁরা প্রায় সব সময়ই রেডিও নিয়ে বসে থাকতেন। দেখতাম এক অদ্ভুত দৃশ্য। যাদের ছেলেরা যে খবরে খুশী হয়ে হাততালি দিত, সেই একই খবরে তাদেরই মুরব্বিরা মুখ ভার করে বসে থাকতেন। ১৬ই ডিসেম্বরে পাক সেনাদের আত্মসমর্পনের খবর শুনে যারাই খুশী হয়েছে তাদেরই মুরব্বীদের চোখে পানি। মুক্তিফৌজদেরও অনেকেরই চোখে পানি। দেখে আমি ঠাওর করতে পারতাম না যে, হাসব না কাঁদব।

আমি পূর্বেই মাফ চেয়ে নিচ্ছি, কেউ কিছু মনে করবেন না। আমি নিজে যা দেখেছি তাই বলছি। সেদিন বেশ কিছু বৃদ্ধ লোকদের বলতে শুনেছি (ঐ এলাকায় ভারতীয় টাকায় তখন কেনা বেচা হত। এসব দেখে অনেকেই শংকাগ্রস্থ ছিলেন) যখন রেডিওর খবর হলো পাক সেনারা জেনারেল ওসমানীর নিকট নয়, ভারতীয় সেনা প্রধানের নিকট সারেন্ডার করেছে, তখন মুরব্বিদের অনেকেই পাগলের মত বিলাপ করতে করতে কত কথাই বলেছেন, যা জানতে মানা নেই তবে বলতে মানা।

একই পরিবারে খুশী এবং বুক ফাটা কান্নার যে একই সঙ্গে সংমিশ্রণ হতে পারে তা জীবনে কোন দিন কল্পনাও করতে পারিনি। কিন্তু সেদিন তা স্বচক্ষে দেখেছিলাম কেন, কিসের টানে? যে টানে খেলার মাঠে পাকিস্তানী প্লেয়ারসহ যে কোন মুসলিম রাষ্ট্রের বিজয়ে হর্ষধ্বনিতে বা খুশীর তুফানে খেলার মাঠ পর্যন্ত কেপে ওঠে। এটা কিসের টানে?

শত্রুদের প্রতি এত মুহাব্বত? কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে- তারা পাকিস্তানী বা আরবী ইরাকী বা ইরানী হতে চায়। তা চায়না তবে মুসলমানদের মধ্যে যে একটা ঈমানী সুতার বন্ধন আছে তা যে থাকবেই তা ভারতও জানে। জানে বলেই তো ... ...।

ভারতের মানেকশ এর মন্তব্য

ভারতের সাবেক সেনা বাহিনীপ্রধান ফিল্ড মার্শাল মানেকশ বলেন- "যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয়, তাহলে ভারতের আশ্চার্য হওয়ার কিছু নাই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে, সেই দিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি।" (তিনি কি থেকে তা উপলব্ধি করেছিলেন? দেখেছিলেন ঢাকায় কোন আনন্দ নেই বরং মুরব্বিরা

islamirenesaandolon.blogspot.com

গুমরে গুমরে কাঁদছিল। বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিলনা। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্যে ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিৎ ছিল কিন্ত আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেনি। তারা বেনিয়ার মত আচরণ করেছেন।"

ফিল্ড মাশার্ল মানেকশ
ভারতের সাবেক সেনাপ্রধান
স্টেটমম্যান, ২৯শে এপ্রিল-৮৮

বন্ধুদের মুখ দিয়ে আজ এসব কথা বেরোয় কেন?

এটা ছোটরা না বুঝলেও বড়রা তা পূর্বে থেকেই বুঝেছিলেন। বুঝে ছিলেন বলেই ১৬ই ডিসেম্বর গুমরে গুমরে লুকিয়ে তাঁরা কেদেঁছিলেন। কিন্ত অবস্থার চাপের মুখে বলতে হয়েছিল জয় বাংলা জিন্দাবাদ। আর যারা তা বলতে পারে নাই তাদের পরপারে পাড়ি জমাতে হয়েছে। এমনটি ৪৭-এ ঘটেনি।

আশা করি ছোট্টরা স্থির মস্তিস্কে আমার কথাগুলো পড়বে এবং দেশটাকে ইসলামী রাষ্ট্র বানানোর চেষ্টা করবে। দেশ ভাগ হওয়ায় কোন ক্ষতি হয়নি। ক্ষতি হবে যদি ইসলামের সঙ্গে শত্রুতা করা হয়। যখনই দেশ ভাগ হয়ে গেছে তখনই দেশের লোক আমরা সবাই তা মেনে নিয়েছি। যেমন ৪৭-এ একবার ভাগ হলে কংগ্রেস পন্থী যারা ভাগ চায়নি তারাও ১৪ই আগষ্টই সে ভাগ মেনে নিয়েছিলেন। তারপর আমরা সবাই ১৩ আগষ্টের কথা ১৪ ই আগষ্ট ভুলে গিয়েছিলাম প্রতি পক্ষের সঙ্গে দেখা করে সেই দিনই তাদের সাথে হাত মিলিয়ে ছিলাম যা একবার পূর্বে বলেছি।

কিন্তু ৭১-এর প্রতিপক্ষরা যে কিসের লোভে এবং কোন সুতার টানে এখনও বাড়াবাড়ি ত্যাগ করতে পারছেন না আমাদের মত নাদানদের মাথায় তা ধরেনা। আমাদের দেশ ছোট হলেও এখনও বহু মুসলিম রাষ্ট্রের চাইতে আমরা বড় আছি। আমরা ভাগ হওয়ায় ক্ষতি হয়নি বরং একটা মুসলিম রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশের মর্যাদাও বিশ্বের দরবারে আজ

islamirenesaandolon.blogspot.com

অনেক বেড়েছে। যা হয়েছে তা আল্লাহরই ইচ্ছায় হয়েছে। আমরা আল্লাহর ইচ্ছার উপরই খুশী আছি। বরং আমার মনে হচ্ছে পাকিস্তানের চাইতে আমরা আরো তাড়াতাড়ি এটাকে ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হব। যদি আল্লাহ সাহায্য করেন।

রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বুঝা উচিৎ যে, শেখ সাহেব যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে রাজনৈতিক সহ- অবস্থানের ব্যবস্থা প্রথম অবস্থাতেই করে গেছেন তখন ২১ বছর পরও ৭১ এর পরাজিত শত্রু কথাটা ব্যবহার করার লক্ষণটা ভাল না। কারণ এর সঙ্গে বর্তমানে যুক্ত হয়েছে স্বাধীণ বঙ্গভুমির আন্দোলন। আর এ আন্দোলনে সেই দলের লোকরাই করছে যারা বলছে'৭১- এ পরাজিত শত্রু।

দেশ ভাগ হলে যদিও সবই তা মেনে নিয়েছি। যেমন'৪৭-এ ১৪ই আগষ্ট সবাই পাকিস্তান মেনে নিয়েছিল।

আমি এ কথা বলিনা যে, দেশের লোক বা কোন একটি দলও পাকিস্তান চায়। পাকিস্তানের সাথে মিশে থাকায় আমরা একটা নামকা ওয়াস্তে বৃহত ইসলামী রাষ্টের অধিবাসী ছিলাম কিন্তু বাস্তবে ইসলামের কিছুই তারাঁ করে নাই বরং ইসলামের কথা বলায় তারাই মাওলানা মওদূদীকে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল।

এখন একদিক থেকেই ভালই হয়েছে। দেশের যে কোন ক্ষতির জন্য কোন বিশেষ এলাকার লোকদের দায়ী করিনা আমরা কোন দলেন লোকই। এখন কাগজের দাম নিজেদের স্বার্থেই বৃদ্ধি করছি। নিজেদের স্বার্থেই গমের রুটি খাই। নিজেদের স্বার্থেই শেরাটন হোটেল ও সোনার গাও হোটেল করেছি, নিজেদের স্বার্থেই নিউজ প্রিন্টের মূল্য বাড়াতে হয়েছে। এ স্বার্থ আমাদের নিজেদেরই এতে কেউ কাউকে দুষি না। এতে আমরা আল্লাহর মেহরবাণীতে শান্তিতেই দিন কাটাচ্ছি। এর কোনটাতেই আমাদের কোন ক্ষতি হচ্ছেনা।

কিন্তু ক্ষতি হবে একটা জিনিষে, তা হচ্ছে যদি আল্লাহ না করুক বর্ডারটা মুছে যায়। এ জন্যে দেশের ১১ কোটি লোক অহরহ আল্লাহার নিকট মুনাজাত করে যে, আল্লাহ আমাদের অবস্থান এমন স্থানে যে আল্লাহ একমাত্র তোমার গাইবী মদদে আমরা টিকে আছি এবং টিকে থাকতে চাই। চির দিনই আমরা টিকে থাকতে চাই

islamirenesaandolon.blogspot.com

উপসংহার

জনাব মেজর (অবঃ) এম এ জলিল সাহেবের লেখা থেকে আরও একটি বিষয় বেরিয়ে আসেছে তা হচ্ছে এই যে, তিনি তার বইয়ে উল্লেখ করেছেন যে ভারতে সর্বমোট ১ লাখ ২০ হাজার যুবক মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং দিয়েছে। আর তৎকালীন ভাতের প্রধান মন্ত্রীর দাবী ছিল ভারতে ১ কোটি শরনাথী এসেছে। তাহলে প্রশ্ন জাগে যারা শরনার্থী হয়েছিল তাদের মধ্যে থেকে কি একশতের মধ্যে একজন গিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং নিতে? এটা দুনিয়ার প্রত্যেকের নিকট অবিশ্বাস্য কিন্তু বাংলাদেশের খবরের কাগজে পাওয়া গিয়েছিল যে শরণার্থী হয়েছিল ২২ লাখ এটা যুক্তিগ্রাহ

এই হিসাবে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর হিসাবটাকে সত্য বলে তো মানা যায়-ই-না বরং সত্যের কাছাকাছি বলেও মানতে কেউ রাজী হবেনা। এখন প্রশ্ন ২ লাখ লোক শরনার্থী হলে গড়ে প্রতি গ্রাম থেকে ৩০/৩২ জন লোক যাওয়া লাগে। এটা আমরা দেখেছি তাতে মানার মত এ সংখ্যাটা।

যদিও সব গ্রাম থেকে এরূপ যায়নি তবুও আমার বাড়ির পার্শ্ব দিয়া ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ ও বরিশালের লোকদের হেঁটে যাওয়ার একটা নিরাপদ পথ ছিল-ঐ পথে যারা ওপারে গিয়েছিল তার খোঁজ নিয়ে দেখেছি গোপালগঞ্জ ও বরিশালের একটা এলাকার বহু লোকই ওপারে গিয়েছিল আর আমাদের এলাকার প্রতি গ্রাম থেকে প্রায় ৫/১০ জন করে ওপারে গিয়েছিল এরা ছিল শুধু যুবক ছেলে। আমিতো জানি আমার শ্বশুর বাড়ী থেকেই ৩জন গিয়েছিল ওপারে কিন্তু ঐ গ্রামের একটি লোকও যুদ্ধে মরেনি।

ঐ গ্রামের আর প্রায় ১০/১২জন ওপারে গিয়েছিল। আমাদের পার্শ্ববর্তী সব গ্রাম থেকেই কিছু কিছু ছেলে ওপারে গিয়েছিল মুক্তিফৌজে ট্রেনিং নিতে। আমার জানা মতে ১৬ই ডিসেম্বরের পরে শালিখা থানার বুনাগাতি ইউনিয়নের হটবাড়িয়া গ্রামের একটি ছেলে মুক্তিফৌজে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। তবে তারা দেশে ফিরে এলে যাদের ওপর তাদের রাগ ছিল- তারা নিরস্ত্র ছিল বিধায়-বরং কিছু লোক মেরেছে। যদি ধরেও নেই যে এক একজন মুক্তিফৌজ গড়ে একজন করে লোক মেরেছে। (অবশ্য একটা তো নিশ্চয়ই মারেনি) তবুও তারা যদি মারে ১লাখ আর পাঞ্জাবী ও রাজাকার মারে ১ লাখ তবুও তো সংখ্যাটা ৩ লাখে ওঠে না। সেখানে ৩০ লাগে উঠে গেল? আমি একই বিষয়ের উপর এত কথা বলছি একারণে যে আমরা হুজুগে বাঙ্গালী যদি

islamirenesaandolon.blogspot.com

শুনি চিলে কান নিয়েছে তবে চিলের পিছনে দৌড়াই কিন্তু কানে হাত দিয়ে দেখিনা। এই জন্য আমার অনুরোধ যে কানে হাত দিয়ে দেখুন। তাহলে দেখবেন সত্য সংখ্যাটা কয়গুণ বৃদ্ধি করে দেখান হয়েছে।

সর্বশেষ আমার কিছু কথা

১। যাদেরকে স্বাধীনতার শত্রু বলা হয় তারা কি করে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান হতে পারে?

২। আমাদের মাগুরার একজন প্রধান রাজাকার (জনাব আঃ আউয়াল) কি করে পৌরসভার চেয়ারম্যান হয়?

৩। জামায়াতের লোকগুলোকে মুক্তিফৌজরা মেরে ফেলল না কেন? আর তারা এত কারচুপির মধ্যেও ১০টা সিট কি করে পায় এই বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনে?

৪। স্বাধীনতার অব্যহিত পরই অর্থৎ ৭৩- এর ডিসেম্বরের নির্বাচনেই দেশের ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মেম্বারদের শতকরা ৬৫%ভাগ লোকই তথাকথিত দালালদের মধ্য হতেই নির্বাচিত হলো কি করে?

৫। দেশের দুটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ বহু কলেজের ছাত্র সংসদে ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্যানেল বিজয়ী হয় কেমন করে?

৬। শেখ হাসিনা মন্তব্য করেন খবরের কাগজগুলো নাকি সব রাজাকারদের হাতে। কিন্তু তা কি করে সম্ভব হলো?

৭। স্বাধীনতার শত্রুদের পিছনে সারা দেশের মুসলমান কি করে নামাজ আদায় করে? বিশেষ করে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই যে ঈদের নামাজ আসল তখন আমি ইমাম হয়ে যেখানে নামাজ পড়ালাম সেখানে (বড় শলই ঈদের মাঠে) আমার পিছনে আওয়ামীলীগের হাজার হাজার লোক নামাজ পড়ল কি করে?

৮। আর মুক্তিফৌজদের সেক্টর কমান্ডারগন কেন চাচ্ছেন এ দেশে ইসলামী হুকুমাত কায়েম করতে?

৯। যাদেরকে খুনী বলা হয় তাদের বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণসহ কোর্টে মামলা করে অপরাধীদের ফাঁসি না দিয়ে তাদের মাফ করা হলো কেন?

১০। অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে এত আগুন বর্ষণ হয় কিন্তু অমুকের পুত্র অমুককে খুন করেছিল এভাবে কোন প্রমাণ থাকলে প্রমাণাদিসহ

islamirenesaandolon.blogspot.com

তার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা হলো না কেন? একজনকে খুনী বললেই কি লোকে তা মেনে নেয়? মানুষের উচিত বাস্তবকে অনুধাবন করা। অযৌক্তিক চিৎকারের কোন দাম কেউ দেয়না। এটাই বাস্তব।

১১। '৭১-এর ভয়াল দিনগুলোতে এদেশের মানুষ পাঞ্জাবীদের হাত থেকে বাঁচার জন্যে আমার খোঁজ করেন কেন এবং আমাদের বাড়ীতে মুক্তিফৌজ ও তার পক্ষের লোক আশ্রয় নেয় কেন? তারা আমাদের বিশ্বাস করে কি করে? এটাও অনুধাবন করা উচিৎ?

১২। বিশেষ করে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র বলে এত চিৎকারের পরও স্বাধীনতা বিরোধীদের বিরুদ্ধে জনগণকে এখনও ক্ষ্যাপানো যাচ্ছেনা কেন?

১৩। বুদ্ধিজীবি হত্যার তদন্ত ও বিচার হোক এটা সবাই যেমন চায়, আল বদর রাজাকারাও তেমনই চায়। বিগত ১৭ বৎসরের সরকারগুলো ক্ষমতায় থাকা স্বত্বেও এর তদন্ত ও বিচার করেননি কেন? তবে কি রুশ-ভারত প্রেমিকদের থলের বিড়াল বেরিয়ে যাওয়ার ভয় ছিল?

১৪। স্বাধীনতার পর যখন বিচার আচারের মালিক মোক্তার তারাই ছিল, তখন কথিত হত্যা, নির্যাতন ও বর্বরতার নায়ক আলবদর ও জামায়াতীদের বিচার করে দু'এক জনেরও ফাঁসি দেয়া হলো না কেন?

১৫। এদেশে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম করা হয় দেশবাসীর কোন মানসিকাতার কারণে?

১৬। ঢাকা ষ্টেডিয়ামে ভারত- পাকিস্তানের খেলায় পাকিস্তান জিতলে লক্ষাধিক দর্শকরা কোন সুতার টানে মৌলবাদী হয়ে উঠে? পাকিস্তান জিতলে লক্ষাধিক দর্শক আনন্দে লাফাতে থাকে আর ভারত জিতলে ষ্টেডিয়াম নিরব নিস্তব্ধ হয়ে যায়?

১৭। যারা কট্টর নাস্তিক- কোন দিনই আল্লাহকে বিশ্বাস করেনি তাঁরা মরে গেলে এই বাংলার মাটিতে তাদের জানাজা পড়া হয় কোন কারণে? এসব কি বাংলার মানুষ বোঝেনা? বোঝে বলেই তো ইসলাম পন্থীরা টিকে আছে।

এই সব প্রশ্নের ভিতর থেকেই খুঁজে বের করতে হবে অনেক কিছু- খুজে বের করতে হবে প্রকৃত সত্য।

আর এর থেকেই বুঝা যায়, এ দেশের মানুষের মন মানসিকতা এবং স্বাধীনতা বিরোধী বলে যাদের বিরুদ্ধে বিষ ছড়ানো হচ্ছে, দেশের লোক

islamirenesaandolon.blogspot.com

তাদেরকে কোন নজরে দেখে আশা করি এরপর থেকে প্রকৃত অবস্থা বুঝতে সক্ষম হবে। আর বাস্তবকে যারা অস্বীকার করে তার আর যাই হোন না কেন তাদেরকে অন্তত ঃ বিজ্ঞ বলা চলে না।

অবশেষে ৩০ থেকে তিনে তিন থেকে দেড়ে দেড় থেকে মূলে এখন ৩০ লাখ ওয়ালারা কি বলবেন?

শেষ পর্যন্ত নোয়াখালির জনাব মোহাইমেন সাহেব আমাকে দারুণ সাহায্য করেছেন, তিনি আমার কথার সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। আমার এ বইটা প্রথম প্রকাশ হওয়ার ১৩ মাস পর তিনি প্রথম বারের মত মুখ খুল্লেন, বল্লেন, শেখ সাহেব এক বিদেশী সাংবাদিককে (৭১ এ লোক মরার সংখ্যা) ৩ লাখ বলতে গিয়ে মুখ থেকে ফসকে গিয়ে ভুল বসত ৩০ লাখ বলে ফেলেছিলেন।

তিনি স্বীকার করেছেন যে আমার বৃহত্তর নোয়াখালি জেলা থেকেই লোক মারা গেছে সব চাইতে বেশী। আর সেই নোয়াখালির লোক মারার সংখ্যাই আমি ৭ হাজার মিলাতে পারিনি। আর এই ভাবে যদি (তখন কার) ১৯টি জেলা থেকে উর্দ্ধে ৭ হাজার করেও লোক মরে থাকে তাহলেও তো দেড় লাখ হয়না, হয় মাত্র ১লাখ তেত্রিশ হাজার) সেটাকে একটু বেশী করে শেখ সাহেব তিন লাখ বলতে গিয়েছিলেন কিন্তু হঠাৎ ভুল ক্রমে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল ত্রিশ লাখ।

তিনি একথাও স্বীকার করেছেন যে আমার জেলা নোয়াখালি জেলাতেই লোক মরেছে বেশী। আমার যারা পাঠক পাঠিকা তারও লক্ষ্য করেছেন যে আমার এ বইয়ের প্রথম সংস্করণেও আমি উল্লেখ করেছি যে, ১৬ই ডিসেম্বরের পরে যেহেতু নোয়াখালিতেই আলেমের সংখ্যা বেশি তাই নোয়াখালির বহু আলেম এমন কি একজায়গায় দুই বাপ বেটা হাফেজ তাদের না মেরে জ্যান্ত কবর দেয়া হয়েছিল ঐ নোয়াখালিতেই।

আপনারা আরো পড়েছেন ঐ নোয়াখালিতেই এক কবরের ভিতর একজন হাফেজকে জ্যান্ত উদ্ধার করা হয় আর নোয়াখালির তৎকালীন আওয়ামীলীগ থেকে পাশ করা এম, পি, এবং মুজিব নগর সরকারের একজন প্রভাবশালী নেতা জনাব মুহাইমেন সাহেব ও সেই সত্যই স্বীকার করেন যে, নোয়াখালিতেই লোক মরেছে বেশি। তবে তিনি একটা কথা বলেছে কিনা তা আমি শুনিনি যে, তিনি ১৬ ডিসেম্বরের পূর্বে লোক বেশি মরেছিল নাকি পরে

islamirenesaandolon.blogspot.com

বেশি মরেছিল তা বলেছেন ক্লিনা। আমি এখন জনাব মুহাইমেন সাহেবের স্বীকারোক্তি মূলক বক্তব্য থেকে কয়েকটা কথা একটু চিন্তা করতে বলব দেশের লোকদেরকে তা হচ্ছেঃ

(১) মানুষ মাত্রই ভুলের উর্ধ্বে নয়, যদি একান্তই কেউ হঠাৎ করে কিছ ভুল করেই ফেলেন তবে তা কি পরে সংশোধন করা যায় না? এবং সৎ মানুষের স্বভাব কি ভুল স্বীকার করা নয় ?

(২) কেউ যদি ভুল করে খুলনার পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ চাটগার পথে ভুলবশত ঃ খানিকটা পথ অগ্রসর হয়ে যান তবে তিনি ভুল বুঝার পরেও কি চাটগাঁর দিকে চলতে থাকেন? যদি সেই দিকেই চলতে থাকেন তবে বা তাকে আপনারা কি বলবেন? আমার মত কম বুদ্ধির লোকতো তাকে পাগল ছাড়া আর কিছুই বলবেনা। আপনারা যারা বেশী বুদ্ধির লোক তারা তাকে কি বলবেন?

(৩) রেডিও টেলিভিশনে যারা খবর পড়েন তারা কখনও বা হঠাৎ করে যদি ভুল পড়ে ফেলেন তখন সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ভুল স্বীকার করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তার ভুল সংশোধন করে নেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেটা শুধরে নিয়ে সঠিক সংবাদটা পড়ে শুনান। কিন্তু সেখানে যদি কোন খবর পাঠক/পাঠিকা ভুল পড়ে তার আর সংশোধন না করেই হঠাৎ করে ভুলবশতঃ একবার যা মুখ দিয়ে বলে ফেলেছে তাই যদি বলে যান তাহলে তার কি চাকুরী থাকে?

মনে প্রশ্ন জাগে, তাহলে এই জন্যেই কি আল্লাহ এই ইতিহাস বিকৃতকারী এবং ইসলামপন্থীদের সারা বিশ্বের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করার মত একটা সাংঘাতিক ধরনের (স্বজ্ঞানের ভূল সংশোধন না করার কারণেই কি তার এক খলিফার খেলাফতির চাকুরিটা কেড়ে নিলেন?

(৪) আমরা আদি কালের এক ইতিহাস সবাই জানি যে আদম (আঃ) ও একটি ভুল করেছিলেন আর আরেকজনও একটা ভুল করেছিল। এরপর আদম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভুল স্বীকার করে আল্লাহর নিকট মাফ চাইলেন। আর একজন তার ভূল স্বীকার করলনা। শেখ সাহেব তো আদমেরই আওলাদ। তিনি কি ভুলটা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করে নিতে পারতেন না? তিনি ভূল স্বীকার না করে কার ভূমিকা পালন করলেন? আদম (আঃ) না যে ভুল স্বীকার করেনি তার?

islamirenesaandolon.blogspot.com

তবে তিনি ভুল স্বীকর না করলেও জনাব মুহাইমেন সাহেব যে আমার ন্যায্য দাবীটা মেনে নিয়ে স্বীকার করেছেন যে ৩০- লাখ কেন দেড় লাখও মরেনি। এতে তিনি যে সত্যটা স্বীকার করেছেন তার জন্যে আমি তাঁকে হাজার বার ধন্যবাদ জানাই। কারণ তিনি একইসঙ্গে আমাকে সত্যবাদী বলে মেনে নিয়েছেন।

(৫) এর পর প্রশ্ন , যার ভুল করা অভ্যাস তিনি কি মাত্র এক বারই ভুল করেন? না বারবার করেন?

নতুন সংস্করনে কিছু নতুন তথ্য দেয়া হল।

ও আল্লাহ! আজ একি শুনলাম

আজ ১৬ই ডিসেম্বর ৯২ বিজয় দিবস উপলক্ষে নারায়নগঞ্জ ইয়োথ ইসলামিক সোসাইটির উদ্যেগে এক সভা অনুষ্ঠিতহয় যেখানে আমি নিজেও একজন দাওয়াতী মেহমান ছিলাম। আমিও কিছু কথা রেখেছিলাম। তবে আমি কি বলেছিলাম তা আগে বলব না। আগে বলব ৭১-এ এই এলাকার যিনি গোড়া আওয়ামী লীগের ও মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন তিনি দাঁড়িয়েই পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসর রাজাকারদের বিরুদ্ধে খানিক বলে নিলেন যা বল্লেন তা এখলাসের সঙ্গেই বল্লেন।

তিনি হচ্ছেন নারায়নগঞ্জের খানপুর এলাকার একজন উল্লেখযোগ্য সমাজ সেবি নামঃ জনাব আলহাজ্জ মহিউদ্দিন সাহেব। তিনি প্রতি বছরই হজ্জ করেন। তিনি পাক বাহিনীর বিরুদ্ধে কিছু বলে নিয়ে শুরু করলেন। ১৬ই ডিসেম্বরের বিজয় দিবসের কথা। শেষ পর্যন্ত এমন কথা বললেন যা শুনে আমার তো চক্ষু প্রায় চড়ক গাছ হয়ে গেল। তিনি অত্যান্ত স্পষ্ট ভাষায় বল্লেন যে ৯ মাস যুদ্ধ চলাকালিন সময় এই নারায়নগঞ্জ থেকে একটা লোকও মরেনি কিন্তু ১৬ই ডিসেম্বর এই এলাকার লোক ভারতীয় সৈন্যদের ভয়ে প্রায় সবাই ঘর বাড়ী ছেড়ে চলে যায়।

তিনি বললেন একদিনেই অর্থাৎ সেই ১৬ডিসেম্বরের বিজয় দিবসেই এ এলাকা থেকে পায় কুড়ি পঁচিশজন মারা যায়। তিনি বল্লেন সেদিন একদিনের ভারতীয় বাহিনীর হাতে যে লোক মারা যায় তা যুদ্ধের ৯ মাসে পাক বাহিনী ও রাজাকারদের হাতে মরেনি। তিনি বললেন সেদিন ভারতীয় গুলি আমার বাড়িতেও পড়েছিল।

islamirenesaandolon.blogspot.com

সেদিন সেই বিজয় দিবসে আমাকে ও কিছু বলতে হয়েছিল। কিন্তু কি বলব তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, তাই একটা গল্প দিয়েই বক্তৃতা শুরু করলাম। গল্পটা একটা বইয়ে পড়েছিলাম যে এক দেশের এক রাজা তার উজিরকে ডেকে বলেছিলেন যে, আমার রাজ্যের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, এখন থেকে আমার রাজ্যে কেউ কাঁদতে পারবেনা। কাঁদলেই তাকে শুলে চড়ান হবে।

এরপর উজির জিজ্ঞাসা করলেন, যদি কেউ মারখেয়ে ব্যাথা পায় তবুও কি তাকে হাসতে হবে? হ্যাঁ, তবুও তাকে হাসতে হবে। উজির পূনরায় জিজ্ঞেস করলেন, যদি কারো মা অথবা বাপ মারা যায় কিংবা যদি ছেলে মরে বা আপন আত্মীয় স্বজন মারা যায় তবুও কি কাঁদতে পারবে না? রাজা বললেন না, তখনও তাকে হাসতে হবে। নইলে শুলে চড়তে হবে। উজির দেশের মধ্যে তাই ঘোষণা করে দিলেন।

ব্যাস; দেশ থেকে কান্না একেবারেই বিদায় নিল, মানুষ মা মরলেও হাসে বাপ মরলেও হাসে, ছেলে মেয়ে মরলেও হাসে কান্না একেবারে উঠে গেল।

শেষ পর্যন্ত রাজা দেখলেন এ কেমন অবস্থা হলো? কান্না যে দেশ থেকে উঠেই গেল। না এরূপ আর চলতে দেয়া যায় না। উজিরকে ডেকে বললেন, উজির তুমি ঘোষণা করে দাও যে এখন থেকে আবার কান্না শুরু করতে হবে। কিন্তু শুলে চড়ার ভয়ে তখনও কেউ কাঁদেনা। এরপর উজির বললেন রাজাকে যে রাজা মশাই কান্না তো সবাই ভুলেই গেছে, কাজেই আপনাকেই আগে কেঁদে দেখাতে হবে। তখন রাজা নিজেই কাঁদলেন।

এবার উজীর বললেন, রাজা মশাই এবার তো আপনার আইনে আপনাকেই শুলে চড়তে হবে। রাজা বল্লেন আমার আইন লংঘন হবেনা, আমার আইনে আমিই শুলে চড়ব। শেষ পর্যন্ত রাজার আইনে রাজাকেই জীবন দিতে হলো।

এই গল্পটা বলে নিয়ে বল্লাম রাজা যদি হুকুম করেন হাসতে তাহলে রাজার আইন মানার জন্যে হাসতে হবে সর্বক্ষণ। ছয় আনা দিস্তার কাগজ যখন ১২ টাকা দিস্তা তখনও হাসতে হবে। মোর্দাকে যখন কলার পাতা জড়িয়ে দাফন দিতে হয় তখনও হাসতে হবে। যখন বাচ্চা ছেলেকে পাকা কলার ফেলে দেয়া ছোবড়া খেতে দেখেছি তখনও মানুষ হাসছে। যখন না

islamirenesaandolon.blogspot.com

খেয়ে মরেছে তখনও হাসতে হয়েছে। যখন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্ররা লাশ হয়ে মা-বাপের কোলে ফিরে যায় তখনও হাসতে হবে।

যখন মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানিকে ১৬ই ডিসেম্বর সিলেট আটকে রেখে পাক বাহিনীকে বাধ্য করা হলো ভারতীয় সেনা নায়কের কাছে সারেন্ডার করতে তখন ও হাসতে হলো। কাজেই ৭১-এর ১৬ ই ডিসেম্বর থেকে প্রতি বছরই ১৬ ই ডিসেম্বর আমাদের রাজ আইন মেনে আসতেই হবে। কাজেই আপনারা কাঁদা ভুলে যান এখন শুধু হাসুন। আমিও আপনাদের সংগে হাসব।

এরপর বল্লাম এ হাসাটা বৃথা যাবেনা, কারণ বর্ডারটা আল্লাহ বহল রেখেছেন অন্ততঃ এ জন্যেও আমরা বিজয় উল্লাস করব। কারণ কমপক্ষে বর্ডার তো আছে। যাগ্যে না বেরুবাড়ী তাতে কি হবে যাক না তালপট্টি তাতেই বা কি হবে, নাইবা পেলাম ৩ বিঘা করিডোরের সার্বভৌমত্ব তবুও যে কয়েক ঘন্টা যাতায়াত করা যায়। হোক না চালু ফারাক্কা, তাতেই বা কি আসে যায়। আল্লাহ বর্ডারটাকে যে টিকিয়ে রেখেছেন এজন্য অবশ্যই প্রতি ১৬ই ডিসেম্বর আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করব। এখানেই আমার বক্তৃতা শেষ।

শ্রোতারা সব নিরব। কারো মুখে কথা নেই। এ প্রসঙ্গে আমার আরো একটা গল্প মনে পড়ে। যা আমার মনেই আছে বলিনা কাউকে। তা হচ্ছে এক বোকা রাজার দেশে আসল এক চতুর তাতী। এসে ঘোষণা দিল আমি অত্যন্ত ভাল কাপড় তৈরী করতে পারি যার কোন তুলনা হয়না, তবে শর্ত হচ্ছে এই যে, যারা হারামজাদা তারা কিন্তু এ কাপড় দেখতে পারবেনা।

তাতী কাপড় বোনে, খটাশ খটাশ করে মাক্কু চলে। মানুষ আওয়াজ শোনে। দেখে কাপড়ের মতই ভাজ করে করে এক জায়গায় রাখছে। হারামজাদা হওয়ার ভয়ে সবাই বলে সত্যই এ কাপড় তুলনাহীন। রাজা বল্লেন উজিরদের তোমরা দেখে আসত কেমন কাপড়। উজিররা সবাই বলল হ্যাঁ, রাজা মশাই সে এক অদ্ভুত কাপড়ই বটে। ওটা একমাত্র আপনার দেহেই মানানসই হবে।

রাজা ঘোড়ায় চড়ে উজিরদের নিয়ে গেলেন কাপড় কিনতে। উজিররা গিয়ে সবাই হারামজাদা হওয়ার ভয়ে বলতে লাগলেন দেখেছেন রাজা মশাই

islamirenesaandolon.blogspot.com

কেমন সুন্দর কাপড়। রাজা মশাইও হারামজাদা হওয়ার ভয়ে বল্লেন হ্যাঁ সত্যই তো খুব সুন্দর কাপড়। তাতী বল্ল, রাজা মশাই আমি আপনাকে আমার কাপড়ের একসেট আপনার গায়ে পরিয়ে দেই দেখবেন আপনার দেহে তা কেমন মানাবে।

রাজা আর কি করে শেষ পর্যন্ত রাজার পরনের ও গায়ের সব কাপড় খুলে পুরাপুরি উলঙ্গ করে নিয়ে তার সেই সুন্দর অদৃশ্যমান কাপড় পরিয়ে দিয়ে ঘোড়ায় উঠিয়ে বল্ল এবার যান রাজা মশাই রাজ দরবারে গিয়ে বসুন, দেখবেন কেমন সুন্দর দেখাবে। হারামজাদা হওয়ার ভয়ে উজির নাজির সবাই বলল খুব ভালো পোষাক।

কিন্তু সর্বনাশ করল রাখাল ছেলেরা তারা আর অত কিছু বোঝে না। তারা রাজা মশাইকে উলঙ্গ দেখে একেবারেই সবাই একযোগে হো হো করে চিল্লিয়ে উঠেছে যে, এই তোরা দ্যাখরে দ্যাখ রাজা ন্যাংটা হয়ে ঘোড়ায় চড়েছে। তখন উজিররা সবাই মনে মনে ভাবছে। তাহলে কি এই সব রাখাল ছেলে এরা সবাই কি হারামজাদা হতে পারে। তখন এক উজির আরেক উজিরের কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা ভাই, তুমি সত্য করে বলত রাজাকে কি ন্যাংটাই দেখা যাচ্ছে? আমিতো ঐ রাখাল ছেলেদের ন্যায় ন্যাংটা দেখছি।

তারপর অপর জনও বলল, ভাই আমিও ন্যাংটাই দেখছি কিন্ত হারামজাদা হওয়ার ভয়ে বলতে পারছিনা কিছু। এরপর রাজাও লজ্জা পেলেন যে আমিও তো আমাকে ন্যাংটা দেখছি। তার পর সবই ছুটল যে ধর ঐ তাতী বেটাকে তাতী ততক্ষণে এপার থেকে ওপারে পাড়ি দিয়েছে তাই ধরবে আর কাকে।

ঠিক তদ্রুপ আমার ঐ রাখাল ছেলেদের মত বুদ্ধি সুদ্ধি কমতো তাই হারামজাদা হওয়ার ভয় না করে হিসাব করে দেখলাম তৎকালীণ গ্রামের সংখ্যা ছিল ৬৮,৩৮৫। ত্রিশ লাখকে যদি ৬৮৩৮৫ দিয়ে ভাগ দেই তাহলে ভাগ ফল হয় ৪৫ এর কিছু বেশি এবং ৪৬ এ কিছু কম। কিন্তু কৈ, কোন গ্রাম থেকেই তো এভাবে লোক মরেনি বরং বহু গ্রামের খোঁজ নিয়ে দেখলাম যে, সে সব গ্রাম থেকে ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে একটা লোক ও মারা যায়নি। এবং দেখলাম বলা হচ্ছে শতকরা ৪০টি বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু কৈ, একটা বাড়ির আগুনও তো আমার চোখে পড়েনি।

islamirenesaandolon.blogspot.com

২/১ টা বাড়ী পুড়লেও আমার সামনে পুড়েনি তাহলে শতকরা ৪০টা বাড়ী পোড়ার কথা কি করে মানা যায়। তিনি খুব আবেগ জড়িত হয়ে জ্বালাময়ী ভাষায় বলতে শুরু করলেনঃ ৯ মাস মুক্তি যুদ্ধকালে পাক বাহিনী বা রাজাকারের হাতে ১টা লোকও এখান থেকে মরেনি বরং শুধুমাত্র ১৬ ই ডিসেম্বর এই এলাকা থেকে প্রায় বিশ পচিঁশজন লোক মারা যায় ভারতীয় বাহিনীর হাতে। তিনি বললেন, আমার মতে ৯মাসে যা লোক মরেছে তার চাইতে বেশী লোক মরেছে মাত্র একদিনে, ১৬ ই ডিসেম্বর।

তিনি বললেন, এই এলাকায় যতগুলো শেল মেরেছিল তার সব গুলিই ছিল ভারতীয় শেল। তিনি বল্লেন, আমার বাড়ীতেও একটা শেল পড়ে, সেটা ভারতীয় শেল ছিল। একথাগুলো বল্লেন হাজী মহিউদ্দীন সাহেব।

২১ বছর পর একজন সত্যিকার অর্থেই সত্যবাদী দেশ প্রেমিকের মুখ দিয়ে এ কথাগুলো শুনে আমার একটা গল্প মনে পড়ল। যার সার কথা হচ্ছে এই যে, সত্য সবারই মনে অবস্থান করে কিন্তু মুখ দিয়ে ফাঁস করতে পারেনা অনেকেই। কিন্তু কেউ যদি একবার ভয় ও সংকোচ ত্যাগ করে সত্য বলে ফেলতে পারে তবে তার দেখাদেখি অন্যেরাও সাহস করে সত্য বলা শুরু করে দেয়।

তাই তৎকালীন একজন সত্যিকার মুক্তিযোদ্ধার মুখ দিয়ে এ কথাগুলো বেরিয়ে আসল। এর পর দেখি তার কথা সবাই সত্য বলে স্বীকার করে নিলেন। আমি মনে মনে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম যে সত্য এখনও সত্যের স্বস্থানেই টিকে আছে।

এরপর শুনি ওরা প্রচার করে বেড়াচ্ছে যে ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত হরণ করেছে। তখন খাতা কলম নিয়ে হিসাব করে দেখলাম ২ লাখ মা-বোনের ইজ্জত হরণ করলে প্রতি গ্রাম থেকে তো পড়ে ২.০০৬ জন মহিলার ইজ্জত হরণ করা লাগে। কিন্তু কৈ, তেমন তো অন্তত আমার মাগুরা মহকুমাতে এর থেকে বাদ পড়ল। তাহলে ২লাখ পুরণ করল কাদের মা-বোনের দ্বারা? এটা আমার মনে প্রশ্ন জাগল। খোঁজ খবর নিয়ে দেখলাম এটা তো অযথা নিজের নাক কান কেটে অপরের যাত্রা ভঙ্গ করার ন্যায়।

ধরে নিলাম দুই লাখ মা-বোনের ইজ্জত হরণ করছে। এটা যদি সত্যই হয়, তবে যারা এরূপ বলে বেড়াচ্ছেন তাদের মা-বোনকে ২লাখের মধ্যে২/১

islamirenesaandolon.blogspot.com

জন ছিলনা, তা কি দাবী করা যায় ? যে ২লাখ ঠিকই তবে আমার কোন মা বোন এই লাখের বাইরে ছিল? তা কি করে দাবী করা যায়?

এ সব চিন্তা ভাবনা করে ঐ রাখাল ছেলেদের মত চিল্লিয়ে বলা শুরু করলাম ৩০ লাখ লোক মরা, ৪০% ঘর বাড়ি পোড়া, ২লাখ মা-বোনের ইজ্জত হরণ এ সবই হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে একটা গোষ্ঠিকে দোষী করার জন্য। এরপর অবাক হলাম তখন যখন আলেমদের মুখেও ওয়াজ মাহফিলে সুনলাম, "এ দেশের ৩০লাখ লোক জীবন দিয়েছে" এতে যে প্রকারান্তর স্বীকার করা হয় যে, সে জীবন গুলো আমরাই নিয়েছি তা তালকানা মোল্লারাও টের পাচ্ছেনা। এরপর সাহস করে আমি যখন প্রথমে বলে ফেল্লাম এটা মিথ্যা। তখন সবাই বলছেন এটা মিথ্যা।

পরবর্তী প্রশ্ন

এই ২১ বছর পর্যন্ত যারা সারা দুনিয়ায় প্রচার করে বেড়াচ্ছেন যে স্বাধীনতা যুদ্ধে এদেশের ৩০ লাখ লোক জীবন দিয়েছেন তারা জনাব মুহাইমেন সাহেবের সত্য স্বীকারের পর চুপ করে রয়েছেন কেন? তারা এখন কি বলতে চান? বলুন না একটু শুনি,আপনারাও ভুলটা স্বীকার করে নিন তাহলে আল্লাহ আপনাদের ভালবাসবেন। আর ৭১এ আমাদের যে বন্ধুরা আমাদের স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিলেন তারা কি (মরহুম মেজর আঃ জলিল সাহেবের ভাষায় বলব) লুটপাটের উদ্দেশ্য আমাদের বন্ধু সেজেছিলেন? আর বেরুবাড়ী দহগ্রাম আঙ্গোরপোতা ইত্যাদি, সিটমহল গুলো ও তালপট্টি, দখল করা ফারাক্কা বাঁধ দিয়ে আমাদের মারার জন্যই কি বন্ধু সেজেছিলেন, এইটাই কি ছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য?

উদ্দেশ্য যদি তাদের মহতই হয়, তবে পাঞ্জাবী শিখ ও কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধীন হওয়ার জন্যে তারা সাহায্যে করছেন না কেন? তাদের এ স্ববিরোধী নীতি কেন? তবে কি বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারতের বন্ধ আর কাশ্মিরী মুসলমানরা কি ভারতের শত্রু। আমি একজন অজ্ঞ মানুষ, বুঝিনা কিছু তাই বুদ্ধিমান ভাইদের নিকট প্রশ্ন রাখলাম। আশা করি তারা আমার ন্যায় বইয়ের মাধ্যমেই এর জবাব দিবেন।

islamirenesaandolon.blogspot.com

আমার পরবর্তী নিবেদন

এ পর্যন্ত যারাই বলেছেন বাংলা দেশের ৩০লাখ মানুষ স্বাধীনতার জন্য জীবন দিয়েছেন (তাদের মধ্যে যারা বেঁচে নাই তাদের বাদ দিয়েই বলছি) তারা মেহেরবাণী করে এই ভুলটা জনাব মুহাইমেন সাহেবের ন্যায় স্বীকার করেন এবং রেডিও টেলিভিশনের মাধ্যমে তা জানিয়ে দিন সারা দুনিয়াকে। দুনিয়া শুনুক এবং বঝুক যে বাংলাদেশে ৭১-এ প্রকৃত পক্ষে কি ঘটেছিল যা কাউকে জানতে দেয়া হয়নি এবং তখন সারা পৃথিবীকে শুধু ভুল তথ্যই দেয়া হয়েছিল।

এ কাজটা যদি করেন তবে আল্লাহর কাছে আপনি অবশ্যই ভাল থাকবেন। এবং আপনাকে দেশের লোক আদি পিতার ভূমিকায় দেখতে পারবে। নইলে সেই প্রথম দিন যে তার ভুল স্বীকার করেনি বরং দাম্ভিকতা দেখিয়েছিল তার ভূমিকায় মানুষ হয়ত আপনাদের বিবেচনা করে বসতে পারে। এইজন্য একটা সদুপোদেশ দিলাম ভুলটা স্বীকার করার জন্য।

এটা আপনারা মানবেন কি না তা আপনাদের ব্যাপার। তবে আমি নির্ঘাৎ বলতে পারি যে, যারা সত্য কথা অকপটে স্বীকার করে তাদেরকে আল্লাহ সত্যই ভালবাসেন। আর যারা যেনে শুনে মিথ্যা বলে তাদের আল্লাহ ভালবাসেন না। আর আপনারা কি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চান না?

একটি গোপন ফাঁস

সম্প্রতি সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা থেকে জনাব আঃ রহিম আজাদ নামক এক ভদ্রলোক একখানা বই বের করেছেন , বইটার নাম

একাত্তরে গণ হত্যার আসল নায়ক কে?

১। শেখ মুজিব পাকিস্তান ভাঙ্গার পক্ষে ছিলেন না।

২। ৭১-এর গণ হত্যার মূল নায়ক কে? বইটায় যুক্তি দিয়ে দেখান হয়েছে যে, শেখ মুজিবের নির্দেশে যারা শেখ মুজিবের দৃষ্টিতে সন্ত্রাস বাদী' ছিলেন, তাদের দমন করার জন্যই পাক সেনারা অতর্কিতে ২৫শে মার্চ কিছ নিরীহ লোকদের উপর হামলা চালায় হামলা যে শেখ মুজিবের অজান্তে হয়নি তার কিছু আলামত উক্ত বইয়ে দেয়া হয়েছে। যার বিশেষ বিশেষ অংশগুলো এতে তুলে দিচ্ছি, যেন সারা দুনিয়া বুঝতে পারে যে,৭১এ কিভাবে উদোর

islamirenesaandolon.blogspot.com

পিন্ডি বুধোর গাড়ে চাপান হয়েছিল। এবং সারা দুনিয়ার ইসলাম বিরোধী গোষ্ঠী তা সত্য হিসাবে মেনে নিয়েছে একমাত্র ইসলামী আন্দোলনকে দুর্বল করার এবং ইসলাম পন্থীদের হেয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে।

কিন্তু যা বাস্তব সত্য তা কদিন আর চেপে রাখা যায় ? আল্লাহর মেহেরবানীতে এ সব তথ্য তাদের মুখ দিয়েই প্রকাশ পাচ্ছে। যাঁরা শেখ মুজিবের একেবারে খাস লোক ছিলেন। শুনুন উক্ত বইয়ে পাকিস্তান ভাঙ্গা সম্পর্কে শেখ মুজিবকে কিভাবে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। নিম্নে উক্ত বইয়ের কিছুটা হুবহু উদ্ধৃতি দেয়া হলো।

"পাকিস্তান প্রশ্নে শেখ মুজিব"

১। ..... আওয়ামী লীগের টিকেটে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান শেখ মুজিব। এই শপথের শেষ বাক্যটি ছিল ঃ জয় বাংলা জয় পাকিস্তান (দৈঃ পাকিস্তান ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৭১) এ শপথে পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ পায়।

২। ..... শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক বিজয়কে সুসংহত করার স্বার্থে সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাস বাদীদ দালালদের বাড়াবাড়ি দমনের জন্য দেশবাসিকে সদা প্রস্তুত থাকার আহবান জানান।

৩। ..... পাকিস্তানের বিরুদ্ধে (তথাকথিত) স্বাধীন পূর্ববাংলা কায়েমের প্রস্তাব তুলে সশস্ত্র যুদ্ধের কর্মসূচী দিয়েছিল যে বিপ্লবীরা, শেখ মুজিবের কাছে তারা হয়েছেন সন্ত্রাসবাদী ও সন্ত্রাসবাদীর দালাল এবং স্বাধীনতাকামী এই সন্ত্রাস বাদীদের খতম করার জন্যে বাঁশ ও সুন্দরী কাঠের (লাঠির) ব্যাপক আয়োজন করেছিলেন তিনি (অর্থাৎ শেখ মুজিব)।

এতে প্রমাণ হয় স্বাধীনতাকামীরা সরকারের দৃষ্টিতেও ছিল সন্ত্রাসবাদী এবং শেখ মুজিবের দৃষ্টিতেও ছিল সন্ত্রাসবাদী এবং পাক সেনারাও যাদের দমন করতে চেয়েছিল শেখ মুজিবও তাদেরই দমন করার জন্যে লাঠির ব্যবস্থা করেছিলেন। তাহলে এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় তিনি পাক সরকারের সঙ্গে পাকিস্তান রক্ষার জন্যে সর্বদাই একমত ছিলেন।

১। ২রা মার্চে তখনকার ডাকসু ভিপি আঃ সঃ মঃ আবদুর রব বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকা

islamirenesaandolon.blogspot.com

উত্তোলনের জন্য শেখ মুজিব তাদের ভর্ৎসনা করেন..... ৭ই মার্চে তার ভাষণের শেষে যে শ্লোগান দেন তাতে জয় বাংলার সঙ্গে জয় পাকিস্তানও বলেছিলেন

..."২০শে মার্চ আওয়ামীলীগের ৩ জন শীর্ষস্থানীয় সহকর্মী নিয়ে শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ১৩০ মিনিট আলোচনা করেন এবং পরে তাঁর বাসভবনে সাংবাদিকদের বলেন" আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতি হয়েছে" প্রশ্ন, কি সেই অগ্রগতি, এটা কি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে অগ্রগতি নয়?

.....২৫শে মার্চ রাতে বন্দী হওয়ার পূর্বে বিশ্ববিখ্যাত ফরাসি দৈনিক লা মন্ডের সাথে দেয়া এক সাক্ষাতকারে শেখ মুজিব বলেন.....

কমিনিষ্টদের খপ্পর থেকে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য তিনিই একমাত্র ভরসা..... 'মুক্তিযুদ্ধের পুরো ৯ মাস শেষে মুজিবের স্ত্রী, শেখ হাসিনা, শেখ রাসেল প্রমুখ ঢাকায় স্বাভাবিক জীবন যাপন করেছেন এ সব কিছু মিলে কি প্রমাণ করে ?

সমাপ্ত

islamirenesaandolon.blogspot.com

৭১ এ কি ঘটেছিল রাজাকার কারা ছিল
খন্দকার আবুল খায়ের

প্রকাশক	ঃ	**খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির** খন্দকার প্রকাশনী বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা ফোন ঃ ০১৭১-৯৬৬২২৯
গ্রন্থস্বত্ব	ঃ	প্রকাশক
প্রথম প্রকাশ	ঃ	ফ্রেব্রুয়ারি-১৯৯০ ইং
চতুর্থ প্রকাশ	ঃ	জুন-২০০৪ ইং
বর্ণবিন্যাস	ঃ	শিশির আহমেদ রুবেল ঐস.আর. কম্পিউটার বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স ৪৫, বাংলাবাজার (৪র্থ তলা) ঢাকা
প্রচ্ছদ	ঃ	বশির মেসবাহ
গ্রফিক্স	ঃ	রীটু সালসাবিল
মুদ্রণ	ঃ	আল্ আকাবা প্রিন্টিং প্রেস ৩৬ নং শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার,
মূল্য	ঃ	**৭০.০০ টাকা।**

islamirenesaandolon.blogspot.com

খন্দকার প্রকাশনী
বুকস্ এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
islamirenesaandolon.blogspot.com